দুই ভুবন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট ১৯৬১

পরিবেশক
নব প্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ পট—অংকন ঃ—
গণেশ বসু

আনন্দম ২১এ/৫ গাঙ্গুলী পাড়া লেন, কলিকাতা-২ হইতে অশোক কুমার সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও পাল প্রিণ্টার্স, ৬৬বি মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে এ. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

"সার্থক সাহিত্যিক তার সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকেই রূপায়িত করেন," উক্তিটি একজন স্বনামধন্য সমালোচকের।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আজ সর্বজনবিদিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস "মানব জমিন" পাঠক মহলের কাছ থেকে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দন।

এই গ্রন্থে সুসাহিত্যিকের দুটি অসাধারণ বাস্তবধর্মী উপন্যাস চিত্রিত করা হয়েছে। "ফেরীঘাট" ও "শূন্যের উদ্যান" যে দুটি উপন্যাস বহুকাল ধরেই অবহেলিত ছিল, ফলে পাঠক সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল। এই দুটি উপন্যাস একত্রিত করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

প্রকাশক

সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চকচকে হয় না আজকাল। রঙটা জ্বলে গেছে, এখানে ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিন হাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালীয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো একপ্লেট টোস্ট একটা আধসেদ্ধ ডিম একগ্লাস দুধ, নুন-মরিচের-কৌটো চামচ—এসব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন-মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। আজ কিন্তু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি-বমি ভাব। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, বার বার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবুও শরীর ঠিকমত ঠাণ্ডা হয় নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মত হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয়নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কৈ শোনেনি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরী ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা-কাম-বেড। সেই থেকে দুজনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা-কাম-বেডে অমিয়। সেইটাই কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ।

সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড়খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মত বিছানা, শামিয়ানার মত বড় মশারি। দাদু ঠাকুমা শুতো, আর সেই সঙ্গে তার রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় নি, যে যার কাজের ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছে, দাদু ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারেনি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশী হয়, এক-আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভাল টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবুও অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মত বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে একবার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনো হাসি সমীহ করেনি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বৌ হয় নি অমিয়র। ইচ্ছে হয়নি বলে হাসি সন্তান-ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালই করেছে। তাহলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র কাছে তার কোন দায় নেই।

—আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে—কী বললে?

হাসি বলে—আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

—কী নেবে?

—এই কয়েকটা শাড়ি ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা স্যুটকেস, কয়েকটা টাকা···

অমিয় শান্ত গলায় বলে—নিও। বলার দরকার ছিল না।

—বলেই নেওয়া ভাল। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা চিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুঁড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কি রকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে—এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসি নি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে একবার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার ওপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা করে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মত দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময়ে রোজই একবার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। একবার হাতজোড় করার ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

আজও তাকাল।

বেরোবার মুখে দরজা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—যা খুশী নিয়ে যেও।

হাসি বলল—যা খুশী নেব কেন? যা না হলে চলবে না সে রকম দু-একটা জিনিস ধার নেব। আবার ফিরিয়ে দেব।

অমিয় বলল—আচ্ছা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আর হাসির কথা মনে থাকে না। দু-চারদিন বৃষ্টির পর গরম কমে গেছে। আকাশ গভীর নীল। বাতাস পরিষ্কার। স্কুটারটা মৃদু গোঙানির শব্দ করে ছুটছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে যত অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেয়। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে কালো রাস্তা। কলকাতার এক রকম সুন্দর গন্ধ আছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে প্রায়ই গন্ধটা পায় সে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয় অন্যমনে।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় তার অফিস। ফুটপাথ থেকেই সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে খাড়া। সিঁড়ির পাশেই ফুটপাথে একটা গেঞ্জী, ব্রেসিয়ার, রুমাল আণ্ডারওয়্যারের স্টল চালায় আহমদ। অমিয়র স্কুটারটা সারাদিন সে-ই পাহারা দেয়। রুমালটা আণ্ডার-ওয়্যারটা আহমদের কাছ থেকেই নেয় অমিয়। বদলে আহমদ স্কুটারটা নজরে রাখে। দরকারে অল্প স্বল্প টাকা ধার দেয়। অমিয়র দু'চারজন পাওনাদারকেও সে চিনে রেখেছে। নীচের তলা থেকেই তাদের তাড়ায়, বলে—তিনতলার সিঁড়ি খামোখা ভাঙবেন কেন, একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

সিঁড়টা সত্যিই খাড়া। উঠতে জান্ বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির আট ধাপে একটা ছোট্ট চাতাল। সেই চাতালটা আহমদের একটা সংসার। দুপুরে তার ভাত আসে, কাছেই কোন স্কুলে পড়ে তার দুই ছেলে, টিফিনে, তারাও এসে হাজির হয়। চাতালে বসে অন্ধকারে বাপ-ব্যাটারা ভাত খায় গা ঘেঁষে লোকজন ওঠানামা করে, ধুলো ওড়ে, কাঠের সিঁড়ি কাঁপে, তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাতালের একদিকে আহমদের পোঁটলা-পুঁটলি, দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামাকাপড়, জুতো।

তিনতলায় উঠতে আজ বেশ কষ্ট হল। অফিস বলতে যা বোঝায় তা তো নয়। ঘরটা বড়ই, তার তিন অংশীদার। আসলে ঘরটার মূল ভাড়াটে কল্যাণ। দশ-বারো বছর আগে এই ঘর ভাড়া নিয়ে 'তৃষ্ণা অ্যাণ্ড কোং' খুলেছিল। আজও কোম্পানী আছে, কল্যাণও আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে আরো দুটো কোম্পানী চালু হয়েছে। একটা রজতের, একটা অমিয়র। তারা দুজন কল্যাণের সাবলেটের ভাড়াটে। একই ঘরে এ-রকম চার-পাঁচটা কোম্পানীও চলে। একটা টেলিফোন আর একটা ঠিকানা থাকলেই কলকাতায় ব্যবসায় নামা যায়।

মিশ্রিলাল বসে আছে। একমাত্র মিশ্রিলালকেই আহমদ কখনো ঠেকাতে পারে নি। ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঠিক তিনতলা পর্যন্ত উঠবেই, উঠে অমিয়কে না দেখলে বসে থাকে, বসে থাকতে থাকতে ঝিমোয়। বিকেল পর্যন্তও বসে থাকে সে। অমিয়কে দেখে মিশ্রি একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাতে একটা টেণ্ডারের চিঠি।

রাজেন গ্লাসে ঢেকে জল রেখে গেছে। টেবিলে কাগজপত্র প্রায় কিছুই নেই। দুটো চিঠি। টেণ্ডার। চিঠি দুটো দেখে রেখে দিল সে। চেয়ার টেনে বসল। রাস্তার ওপারে গভর্নমেণ্টের একটা স্টোর। লরী থেকে মাল খালাস করছে। রাস্তায় ট্রামের শব্দ হচ্ছে, বাস যাচ্ছে। কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ আটকাল অমিয়।

মিশ্রি বলল —কিছু দেবেন নাকি ?

—ও সপ্তাহে।

—ও বাবাঃ, তিনমাস হয়ে গেল। আমিও মাল তুলতে পারছি না, একজনকে নিয়ে তো আমার কারবার নয় !

—ও সপ্তাহে এসো।

—পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

—কোত্থেকে দেব ? পেমেণ্ট চারমাস আটকে আছে।

—কেন ?

—সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকণ্ডিশন মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল। তখনো জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেশিন স্ক্র্যাপ, পেমেণ্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক-চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

—সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে !

অমিয় একটু হাসে। বলে—ডুবিয়ে যাবে কোথায় ? ঠিক পেয়ে যাব।

—বিলটার জন্য কবে আসব ? আমার তো বেশী নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরীব মানুষ।

—মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেণ্ডার। দুটো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাব। এখন সেনগুপ্ত নেই, আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে—তিনমাসে পেমেণ্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু

কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ-সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বন্ধু ?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভাল লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখে বলে—এবার কাটো তাহলে।

—সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

—রোজ আসতে পার। কিন্তু লাভ নেই।

—বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেণ্ডারের চিঠি দুটো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্যমনস্ক ভাবে; ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মত। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুব-সাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ-কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ি যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাসে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি? চাকরি করবে? তারপর? চাকরিই করবে! চাকরিই করে যাবে বরাবর! কিছু মনে পড়বে না! একা লাগবে না! খারাপ লাগবে না!

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে! তৃষ্ণা কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম-ট্যাক্স। কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা-চিন্তা করার মত মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশী ভাবতে গেলেই মাথায়

সমুদ্রের মত বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ একবার তাকিয়ে বল্ল—কোন দিকে যাচ্ছেন?

—যাই একবার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

—মিশ্রিলাল কত পায়?

—ন'শো।

—গতকাল আমি একটা পেমেণ্ট পেয়েছি। শ' চারেক দিতে পারি। মিশ্রিকে আপাততঃ কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

—কেন?

—ফুড সাপ্লাইয়ের টেণ্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রিকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

—আপনি তো দুশো অলরেডি পান।

—দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়।

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ও রকমই। খুব মহৎ কাজও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সেরকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভীড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।

কাঁচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

—ভাল খবর মশাই।

—কী?

—আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেণ্ডার আমরা নেবো। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য?

—কত টাকার অর্ডার?

—কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাততঃ পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পাল্টাতে না পারেন তবে অন্ততঃ মেরামত করে দেবেন, কিছু কিছু ছাঁট-কাট হবে। সাত-হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে

যাবেন। কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালই। খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুশকিল। পেমেণ্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে!

—কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

—বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে—ড্রিঙ্কস্?

—একটু-আধটু।

—মেয়েছেলে?

—নীল।

—স্মোক?

—দিনে চল্লিশ পঞ্চাশটা।

—চেক-আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা এসে যায়। দামী চায়ের গন্ধ। ভাল লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগা-মেশান পুরনো কোম্পানী। ব্রিটিশদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবী। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নীচু নজরে দেখবে এখন. বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে।

লাহিড়ীর খাঁই বেশী নয়। ওয়ান পার্সেণ্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ-অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

লাহিড়ী হাসল। বলল—সেনগুপ্তের খবর কী?

—খবর নেই।

—ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ!

—ও-সব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেন নি।

অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ-বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেণ্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবেনা। পেমেণ্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছুই থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রোল, পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায় সে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রোলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভাল লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রোলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মত শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্ণ দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য-কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দারুণ দারুণ বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। কোটি কোটি টাকার লেন-দেন।

অফিস, কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমার বাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি স্টীলের আলমারীতে শ'তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড়জোর শ'খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউণ্টস

অফিসার ছিল। এখন কি আর একটু ওপরে উঠেছে! সাহেবী ব্যাঙ্ক, একগাদা টাকা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কিন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ঐরকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনো অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোন কাজ নেই। তবু একবার অনেকদিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভাল নেই।

কাউণ্টারে ভীড়। অজস্র সুন্দর কাউণ্টারে ছাওয়া চারদিক। রঙীন দেওয়াল, টিউব-লাইট—সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিওন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ওপাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট হয় তার। গোলাপী রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত।

একবার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিয় একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ঐরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই। অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ঐ একটা রক্তের গূঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা একবার একফাঁকে প্রশ্ন করে—শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস?

—হুঁ।

—কেন?

—শরীর ভাল নেই।

—কোম্পানী লালবাতি জ্বলেনি তো?

—জ্বলেছে।

—জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস?

—কত?

—হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

—মাসে ওর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেরা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি-রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠাণ্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কী!

—তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে তারপর বলে—সোনাদা, তুমি কি প্রমোশন পেয়েছ?

—চাকরিতে থাকলে প্রোমোশন হয়। তোর মত ব্যবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

—তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

—তাহলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না।

—তোকে ধার দেবে কেন? ইণ্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয় কথা ছিল।

—যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইণ্টারেস্ট দিই?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে বলে—তোর আবার সিকিউরিটি কী? একটা পুরানো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর? বড়জোর একখানা রিফিউজি

সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস! কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও একটা মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায়?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞেস করে—প্রবলেমটা কি?

অমিয় উত্তর দেয়—তুমি বুঝবে না। মানুষ কতরকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা!

—তোর গাড্ডাটা কী রকম?

অমিয় শুধু হাসে। চারদিকে একবার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম রাবারের গদীওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল্-এর মত। ঘষা কাচের দরজা, ঢেউখেলানো কাঁচ দিয়ে তৈরী ঘরের পার্টিশন। ওপাশে লোকজন চললে কাঁচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইণ্টিরিয়র ডেকরেটর অন্ততঃ দশ বিশ হাজার কি তারও বেশী নিয়েছে। এ-রকম একখানা অফিস-ঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। হবে না আর। এ-রকম নিস্তব্ধ, কাঁচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়. এ-রকম ঠাণ্ডা ঘর, ফোম্ রাবারের গভীর তলিয়ে-যাওয়া গদী, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো—এইসব আর কোনদিন হবে না।

—লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা?

—তোর মুণ্ডু।

—এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে?

—তোর মত দশটা ব্যবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

—এরা তোমায় বাড়ি-ভাড়া দেয়? গাড়ি?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক-আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে—উঠি।

—বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা!

—কিছু না।

—টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে—না।

—দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস ; ব্যাঙ্কের টাকা নয়, আমার টাকা।

—কোনদিন নিয়েছি ?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে —তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েণ্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মত নীচু হয়ে যাব।

—তার মানে ?

অমিয় হাসে—আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

—সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব ; শুনবে ঠিক ?

সোনাদা ভ্রু কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড্ করে।

—আমি প্রায়ই একটা ষ্টিমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়ে-চড়ে বসে বলে—কী রকম ?

—আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল —তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত পর্যন্ত। কখনো কখনো দেখি, রাতের ষ্টিমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ওপারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বল তো ?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

—এ কি মৃত্যুর-প্রতীক নাকি ? অমিয় বলে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে ?

—ইয়ার্কি নয় সোনাদা। কাজ কর্মে ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ঐ বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এই-সব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা

একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইন্ডিয়া কিংসের সোনালী প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়-বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনদিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে—এ সবই নস্ট্যালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠান্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে—না এটা শৈশব-স্মৃতি নয়। ষ্টিমারঘাট আমি আর ক'বার দেখেছি। দু তিন বার বড় জোর। তারপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তাছাড়া সেই ষ্টিমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দী ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলা জল, ওপারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে—ভাল খাওয়া-দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে—কেন ?

—তাহলে ওসব সেরে যাবে।

—সারাতে চাইছে কে ? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভীড়ভাট্টা, গরম ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা ষ্টিমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন ? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জানো ?

উত্তর দেওয়ার সময় পায় না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পার্সী মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফর্সা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ী পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডানদিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এরকম শাড়ীতে হাসিকে ভাল মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই একধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ন বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক-আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, ইর্‌রেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভাল থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়ীটায় বোধহয় এখনো মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে একবার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা। অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে, বা দু-একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই

মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাঁটে। সোনাদা আবার কাজকর্মে ডুবে যায়। একজন দুজন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে, চমৎকার ইংরেজীতে কথা বলে। বিজনেসের পিক-আওয়ার। সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে—সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে—সামনের সোমবার নিণ্টুর জন্মদিন। তোর বৌদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

—আচ্ছা।

—তোর ষ্টিমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। ষ্টিমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাঙ্কটা থেকে বেরোতেই জ্বরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের। গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল

সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এক-কামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শব্দ টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা! রোগা গড়নের বলে বয়স খুব বেশী দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দুধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক দুদিন ছুটি নেয়। চোদ্দ বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কণ্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয় নি। কণ্ট্রোল উঠে যাবে বলে চাকরি কারোই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভাল লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মন-প্রাণ দিয়ে চাকরি করে! ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর এক-কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

—সোমাদি, কেমন আছ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে—বেরো, বেরিয়ে যা।

—কেন?

—লজ্জা করে না? একবছরের মধ্যে একবার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয় নি? কতবড় অসুখ গেল মা-র, তোকে দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো—কেন এসেছিস?

—তুমি কত মাইনে পাও?

—তাতে কি দরকার? চালাকি ছাড়।

—চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

—ভারি তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না। অমানুষ!

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ওপাশে সোমাদি। বলে—এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

—তার মানে?

—আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামেলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছ বাবু? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ি। বুঝলে সোমাদি, কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুরমার বাড়ি যে আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমরা ভাবতেই পারি না এখনো। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী! ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এসব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে—একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যাবেন, কেমন। খুব খুশী হব।

সোমাদি একটু হাসে। বলে, তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক তাই দাঁড়িয়ে গেছে। একবছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস?

—গত একবছর ধরে আমি ভাল নেই সোমাদি।

—কী হয়েছে?

—তুমি কত মাইনে পাও বললে না?

—জেনে কী হবে?

—এমনিই। কৌতূহল। বল না?

—সব কেটে ছেঁটে পৌনে আটশো। হাসি কেমন আছে?

—ভাল। গত বছর তুমি একটা স্টীলের আলমারী কিনেছ, আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে—এ বছর একটা সুতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে আসিস।

—পোনে আটশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরির রাস্তা নেই।

—এইসব জানতেই এসেছিস। হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

– তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা, তোমরা এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

—কী করব। তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্ট-সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি সিগারেট খাই না, সাদামাটা পোশাক পরি, সিনেমা দেখি কালে-ভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চা কাচ্চা হবে নাকি?

—তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?

—দূর পাগলা, তোর হয়েছি কী? এসব বলছিস কেন?

— তুমি এত কষ্ট করছ কেন?

—কেন আবার, নিজের জন্য।

—দূর! নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশী কাকে ভালবাস সোমাদি?

—কী জানি? তোর হয়েছে কী?

—কিছু না।

—হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভাল করে চিনলই না।

—যাব একদিন ঠিক আগে বল, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?

—বললাম তো, নিজের জন্য।

—তবে তো তুমি নিজেকে ভালবাস।

—বললাম তো, বাসি।

—আমি বাসি না।

—তুই হাসিকে বাসিস। ভালবাসলেই হল।

—নিজেকে ভালবাসলে হাসিকেও ভালবাসা যায়। এই যে তুমি

নিজেকে ভালবাস বললে, স্বামী-পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হয় না। ভালবাসা তো মাস মাইনে নয় যে টান পড়বে।

—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে? বল দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাঁটি হলে—

—প্যাকামী করো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জান? ঐ ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।

—তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালবাসা-ভালবাসা করছিস কেন? কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই। একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দৈ খা।

—আমার মুশকিল কি জানো?

—কী?

—আমি হাসিকে ভালবাসতাম, ব্যবসাকে ভালবাসতাম, স্কুটারকে ভালবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট এসে পড়ছে।

—স্টীমারঘাট?

—হুঁ।

সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে—কী বলছিস?

—খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনো কোন নির্জন ফেরীঘাট দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী—ওপারটা ধু ধু করে—দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।

সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপ-ওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মত মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।

—কোন্ স্টীমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, নাকি গোয়লন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরীঘাট দেখেছিলাম।

—ওসব নয়। এ একটা অন্যরকম ফেরীঘাট। বহু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল—চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালও লাগে।

—আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা

ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা ?

—হাজার দশেক।

—সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল। বাঙালী ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে। তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

—স্টীমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জান না, না ?

—কী জানব ? তোর মাথায় যতসব পাগলামীর পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল ?

—তোমার কিছু মনে হয় না ? স্টীমারঘাট বা ওরকম কিছু ?

সোমাদি হাসে। বলে—আচ্ছা জ্বালাতন ! ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো ? সকাল সাড়ে আটটার লেডীজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস-রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী ? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে—তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে—তোর দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে ! কত কী মনে হয়। ওসব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল। ফেরার সময়ে একখানা শাড়ি আর দুটো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেল রেষ্টুরেণ্টে খাস। এরকম একটু আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

—তুমি এসব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি ! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কী রকম সব মান-অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না !

সোমাদি হেসে ওঠে। বলে—ঠিক বলেছিস।

একজন দুজন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

—চলি।

সোমাদি প্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে

অন্যমনস্কতা। সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভাল না, কখন কী হয়ে যায়।

—যাব।

অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইন্সিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গত বছরের প্রিমিয়াম বাকী। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দু বছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড-আপ্ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে—বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের অজিতকে একবার ফোন করবেন, ওকে আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড-সাপ্লাইটা ছাড়বেন না…

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে—বাগচী—

—উঁ।

—আমার কাছে কেউ এসেছিল ?

—না।

—দূর! কেউ আসে নি!

—রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।

—করেছি। ও তো বিশবার বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট আনতে। আমার মোটর পার্টস্‌টা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী। কাল ডেলিভারী নিতে আসবে।

অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনো ফর্সা রোদ।

রজত তার চেয়ার টেনে বলে—ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা

পেয়ে যাচ্ছি কাল।

—কবে রওনা ?

—দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন্‌ হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন ?

—খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।

বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পয়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে—খুব দামী সিগারেট কী আছে বলুন তো ?

—আপনি তো খান না।

—আজ খাব।

—ইণ্ডিয়া কিংস্‌।

রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে—ইণ্ডিয়া কিংস এনো এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।

অমিয় হাসে।

—শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী।

—কী ?

—এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভাল জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপণ্ডেস করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মত ফেরত পাঠাবে না তো ?

—সকলের কপাল সমান না।

চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে—অবশ্য মাধুও জানত না। কোম্পানী ওকে তবু রেখে দিয়েছে।

অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোন জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টীমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিয় ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখে। একটা মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা কলসী, কোমরের কলসীটা কাৎ করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল

পড়ে যাচ্ছে।

রজত মুখ তুলে বলে—আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল, বুঝলেন বাগচী!

—হুঁ।

—সেটার কি করব বলুন তো?

—আপনার কী ইচ্ছে?

—ইচ্ছে নেই।

—অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে—চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফঁ্যাকড়া রেখে যাই কেন! মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বরাবর থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভাল হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে—হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে একবার শিস্ দেয়, দু'কলি গান গুণ গুণ করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের অজ্ঞান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

— রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেকদিন ধরেই অমিয়র সময় ভাল যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে সে যে-ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লীজ নেওয়া। লীজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা, এবং আরও কয়েক-জনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা

একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক, নিস্তব্ধ মানুষ। কোন কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন করবে বুঝতে পারে না। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডায়াল টোন শোনে। কিড়-কিড় শব্দ হয়। কোন নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডায়াল ঘোরায়। তারপর তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত···। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চীৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে?' বলে চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজ্‌ড্‌ সাউণ্ড। ধীর কান্নার মত বিষণ্ণ শব্দ। কতবার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র। মুখটা তেতো-তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খাইনি। মাথাটা ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায় আর স্কুটারটা রাখা যাবে না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহমদকে বলবে একটা গোপন জায়গার বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখানে রাখলে কেমন হয়?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট

শুনতে পায় ওপাশে দু-একটা কলকব্জা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হোরাইজণ্টাল খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা। কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয়? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজ্ড্ থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কানেকশন ঠিকই পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওপাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা! সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহুদূর। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গডানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মত চক চক করে ওঠে জোনাকি পোকা। এ-পাড়ে দিনের আলো থেকে ও-পাড়ে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর-দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ওপাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।

ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্না-ঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চিঁ-চিক-চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়-কুড়-কুড়-কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে। থাকে থাকে শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয় নি। ট্রাঙ্ক ভর্তি রয়েছে শাড়ী, র‍্যাকে নানা-রকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকি-টাকি। এসব কিছুই নেবে না সে। দু-চারটে মাত্র নেবে—যা নাহলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে-সেখানে ফুটো।

গরম জামার থাক ভর্তি জামাকাপড় কেটে রেখেছে। কত কি কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামাকাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরোনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু-বাণ্ডিল চিঠি। চিঠির বাণ্ডিল তুলতেই ঝুর-ঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু দফায় দিল্লী আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু-মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দুবার বাপের বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। ''প্রিয়তমাসু...' হাসি পড়তে থাকে—'তোমার জন্য ভাষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কি বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না...রাণী আমার, আমা (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)...'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয় প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু-চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনো ইনল্যাণ্ডের একটার বেশী ফ্ল্যাপ ভর্তি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কি করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? নাকি পুড়িয়ে ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকবে। থাকতে থাকতে একদিন পুরোনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর মারা বিষ। তারপর একে একে ট্রাঙ্ক বাক্স, স্টিলের আলমারী—সবই খুলে ফেলে সে। জামাকাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই রয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা কয়েকটা জামাকাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন

সামার-রাশ। জামাইবাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর-দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়াড'রোবে, খাটের তলায়, রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি। বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝন্‌ঝনে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরী করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের মত। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে! মধু রান্নাঘর ধোলাই করেছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা-দরজায় সবুজ পর্দা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার। খাট, আলমারী, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা কিছু আছে, যা ধরা-ছোঁয়া যায় তার কোনটাই কি একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেল, সারাবেলা বল ভালবাসার কথা, পোষা পাখীর মত, ওয়াড'-রোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারী দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই কি একশো বছর ধরে জমা থাকবে—এতদিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা আইনগত ভাবে স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে—থাকগে। নাকি কোনদিনই টিকিটটা ঠিকমত সাঁটা ছিল না খামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয় বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা কলকাতা!

গরীব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা-বাগানের কেরানী। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসী,

তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই মাসীই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি-এ পাস করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরী নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গানবাজনা—এ সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এই সব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা! চা-বাগানে তার ছেলেবেলা কেটেছে। চারদিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চা-পাতার মাতলা গন্ধ ম-ম করত বাতাস। রাতে ফেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচেকানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মত মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝির ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির ভাপ কুয়াশার মত হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল করত। পাহাড়ী পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে যেত। তারা ভাইবোনেরা উৎরাই ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোষাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই বাগানে তার ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশীরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প, গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্প বলতেন সুন্দর আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেই সব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ-যন্ত্রণা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মত ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত—চল না বাবা, কলকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত—দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কোন কাজও নেই সেখানে, খামোখা টাকা-পয়সা খরচ করে চারদিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত—কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশী না, গাড়ি-ঘোড়া বেশী না, চারদিকে জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসীর বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ।

তখন তার মনে কলকাতার বীজটি ফেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মত জায়গা নেই। সাতবছর সে শিলচরে কলকাতার আরো বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসীদের আত্মীয় হারুকাকার ক্যান্সার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গৌহাটি রেডিও থেকে। সে প্রায়ই বলত—মফস্বলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে—কলকাতা, কলকাতা। তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এস। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে। খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেই সব বন্ধুদের কাছ ঘেঁসে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে-চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসীকে বলত—মেসোকে বলত—কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চল একবার কলকাতা যাই। মাসী মেসো সমস্বরে বলত—সে ভারী দূরের রাস্তা, পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভীড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মত সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে সব কল্পনা হাসির—সে সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মত তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা-লতা তার ওপর দুচোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে বোধহয় কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনো যায় নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা নিজেদের মধ্যে চোখ-টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক

শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি অনেক দেখেছে বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেণ্ডারে। কখনো জি-পি-ও-র ঘড়ি, হাওড়া ব্রীজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেণ্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকানপাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ সবের অতীত, কিংবা এসব মিলিয়ে কলকাতা এক মন্ত্রের মত। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ, তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মত আকর্ষণ! দূর দূরান্ত থেকে, প্রেমিকারা চলেছে কলকাতার দিকে! কেবলই চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় একবার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত কলকাতায় যেতে হলে কোনটা যে দরকার হবে, কোনটার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ কথা খুবই সত্য যে তার সব কিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা বিয়ের সম্বন্ধ মাসীই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে—যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিও। মাসী অরাজী ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমত যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত-ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড় দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরী নাচে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রঙ চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির ভালই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চারমাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল প্যাটিপত্র, এমন কি আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চারমাস সময়। মাসীর অ্যালবামে পাত্রের ফটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফটো। মাসী মাঝে মাঝে হাসিকে

অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত—দ্যাখ হাসি !

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা। বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো বহ্নিমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মত। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি !

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজী। হাসি মাসীকে গিয়ে ধরল -এখনো চারমাস বাকী। একবার ঘুরে আসি মাসী। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

—বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি গাইবি, সেটা কী ভাল দেখাবে ? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে !

হাসি হাসে—কলকাতার জলে রঙ ফর্সা হয়, জানো না ?

অনেক বলা-কওয়ায় মাসী রাজী হল।

কলকাতা কী রকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম দিনের মতই। বহুদূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুম গুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কী বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া ? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা-উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চারদিকে সর্বক্ষণ এক শিশু বয়সের বিস্মৃত রঙীন মেলার মত কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড়

হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। একের হৃৎস্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের। সঙ্গে আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব —মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি জামাইবাবু। এ ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কতদিন দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ্য করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ্য করবে হাসি? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে?

দুই পক্ষের দিদি জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিস খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দুপক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ্য করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশীমাত্রায় লক্ষ্য করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল—চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজী হয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিলে—যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল। কয়েকটা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো, তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল। যৌবনকালে একশো

ছেলে ভালবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আসামের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘকালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সদ্য ব্যবসা শুরু করেছে। কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দুহাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল। এসে গেল, আবার এলও না। সারাদিন টাটা-বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে? স্বামী? তার মনে পড়ত, সারাদিন সে অমিয়র কথা ভাবেই নি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালবাসা? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি-জামাইবাবু এসে বলতেন—হাসি, তোমার বাবা মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমরা কী লিখব ওদের?

—দোষ! আপনাদের দোষ কী?

—দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল।

ভালবাসা! হাসি ভারি অবাক হত। ভালবাসা কিসের! কাকে! অমিয়কে? অমিয়কে তো সে কোনকালে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখীর মত তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ'মাস পরে মাসী আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

—এটা কী করলি হাসি? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

—কী চেয়েছিলি ?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল—কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কী ? থাকে। শরীর বহতা নদীর মত, শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীর বেশী দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণী বৃত্তটা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ। পুবের বাতাসে পর্দা উড়ে আসছে। উদ্দিহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্চির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট্ট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে! এত দূর এসেছিলি কেন ? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে ? লাল টুকটুকে হাত-পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মত রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে চুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি—ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু, ইদুঁরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জামাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায় !

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। ঢাকুরিয়া থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রোল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

—জামাইবাবু, আমি হাসি।

—বল।

—আমার রিজার্ভেশনের কী হল ?

—হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভীড় হচ্ছে। এখন সামার-রাশ।

—রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার ?

—থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এস না। তিনদিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে ?

—এত লোক যাচ্ছে কোথায় ?

—কলকাতা থেকে পালাচ্ছে ; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

—আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

—তা তো করছিই না।

—কেন ?

—তুমি সুখের পাখী উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কী হয় !

—আমার যে যাওয়াটা দরকার।

—কেন ?

—যাব না কেন ?

ওপাশে জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।

হাসি তীক্ষ্ন গলায় বলে—কেন ?

—ভয় পেও না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসেনি।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ও এসেছিল একটা স্টীমারঘাটের কথা বলতে।

—স্টীমারঘাট !

—স্টীমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা স্টীমারঘাট দেখতে পায়।

—তার মানে ?

—তার মানে তোমাকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

স্টীমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার স্টীমারঘাট।

—তার আগে বল, ওর ব্যবসার অবস্থা কী ?

হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বোধহয় ভাল না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।

—আর এ সময়ে তুমি সুখের পাখী উড়ে যাচ্ছ ?

—আমি কী করব জামাইবাবু ?

—ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।

—আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন ? কাছে-পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চার-দিন ধরে যাওয়া তো সে ভাবে সম্ভব না।

—দেখছি।

—আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশির বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন ?

—বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র স্টীমারঘাটের কী হবে ?

—আমি কী জানি।

—হাসি, অমিয়র ওজন কত ?

হাসি হেসে ফেলে। বলে—আমি কী দাঁড়িপাল্লা ?

—না। কিন্তু বৌরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।

—ফোন রেখে দেব কিন্তু।

—আমি ইয়ার্কি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি কে. জি. ওজন কমে গেছে।

হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভাল-বেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।

—জামাইবাবু, আমি, ওর সঙ্গে ঝগড়া করি নি। আমাদেব মধ্যে কোন ভুল-বোঝাবুঝি নেই।

—তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চারবার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল বোঝাবুঝি ? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু গত চারমাসেও আমার ওজন দুই কে. জি, বেড়েছে।

—ওজনের কথা বলছি না।

—আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন কমে যাচ্ছে কেন ?

—আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি —

— ছেড়ো না। শোন, স্টীমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনো বলে নি ?

—না।

—আশ্চর্য !

—আশ্চর্যের কী? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।

—কিন্তু স্টীমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

—কেন?

—স্টীমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, আর এমন ভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

—কী রকম স্টীমারঘাট সেটা?

—খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহুদূর গড়িয়ে নেমে গেছে··· কিন্তু ফোনে অত সব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।

—আমি শুনব কেন জামাইবাবু? আমার কৌতূহল নেই।

—তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি?

—বললাম, তো, খুশীর বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।

—সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি?

হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখে।

আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুর-গোলা রঙ ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব রঙ। জলে ছায়াছবি। রাস্তাগুলো ভেজা, রাস্তার নীচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভাল লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো-কেসে সে সুন্দর সুন্দর শাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কী ভীড় চারদিকে। তবু এ ভীড় বড় রঙীন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরোনো ভালোবাসার টানে ছুটি-ছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদি জামাইবাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিনবছর ধরে ঘুরছে এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনো ফুরোয় না।

একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামতে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোনো নেমন্তন্ন-বাড়ীর এঁটো-

কাটার রাশ খবরের কাগজে জড় করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রামলাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে—কলকাতা, কলকাতা।

চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

—হুঁ।

—আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

—গত দুমাস কিছু চাইনি। জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেন্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে—সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে—কাঠের সিঁড়িটা বড় পুরনো হয়েছে; বেড়াল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কী করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভুত হয়ে আসনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ-হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

—বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিনহাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে—দুটো সরকারী অর্ডার আছে কালীচরণ, পনের হাজার টাকার। করবে?

—আপনি পেয়েছেন?

অমিয় মাথা নাড়ে—আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে আপনি কত পারসেণ্ট নেবেন?

—এক পয়সাও না। শুধু পেমেণ্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

—অর্ডার দেখি—বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে—মাত্র আট পারসেণ্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস দেড়মাস আগেকার দর। গত একমাসে মেশিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রীংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পারসেণ্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেণ্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

—তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে—করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে রজত টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। রায়চৌধুরী এখনো আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল—কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার দুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

—কেন?

—সরকারী অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনের হাজারে তোমার অন্তত ছ'হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড বিড় করে বলে—দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে—দেনা-পাওনা আবার কী? বাগচীর তিন হাজার ঐ অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

—তার মানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনো পাই—

—না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

—তাকে পাব কোথায় ?

—বাগচী তার কী জানে কালীচরণ ? ছোট কোম্পানী, আট-দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়বিলিটি সব রেখে গেল—এটা কী মগের মুল্লুক ?

—আমি তার কী জানি।

—তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর ষাট আছে আমি জানি। সে-ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী ভাল লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সবকারী অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ কবে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে—সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে। এখন বেবোও—

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহঙ্কাব তার এখনো আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গীতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশ-শার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দুটো রাখবার জন্য তাকে অনেকবার কল্যাণ বলেছিল। তিন চার মাস কোন অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দুটো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোটো উৎসব করেছিল। সাবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরী রুটি এসেছিল, আর কে-সি দাসের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জী, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানী। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কী করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তা এসে গেছে। তারা কেউ কখনো তিনটে কোম্পানীকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয়

তাহলে কী ? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জী আর সেন, যেমন সেনের কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জী। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নীচু করে ছিল।

রজত ইণ্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে—আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে—আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রু কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে—গত তিন মাস আপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

—আমি পারতাম না।

—আমরা চালিয়ে দিতাম। আফটার অল উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারী বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে—জার্মানী থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? নাকি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হেসে বলে—কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যারেডদের ঐ এক বিপদ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে—সেন, লক্ষ্য করেছেন কালীচরণের পায়ের কোন শব্দ হয় না!

—কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে—বাস্টার্ড। আপনাকে কী সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টের টাকা তুলে নিল, আদায় করে নিল চার চারটে বিল-পেমেণ্ট, সমস্ত লায়াবিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় একবার হাত উল্টে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে—ব্যবসা আপেনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভীতু হয়ে যাচ্ছেন, লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোন শব্দ হত না—এই সত্যটা আবিষ্কার করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানীর চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানীর টিমের নামকরা গোলকীপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনালটি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট্ পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাই-চাকী ভেঙে পড়ে রইল ছ'মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পীচের রাস্তার মত গড়গড়ে ইংরাজী বলত। সাপের মত সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রুর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল যখন সেনগুপ্তর মত বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছ'মাস ন'মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনো তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনো তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলস্ম্যান হিসেবে! সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে-ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরীঘাট জাহাজের মত ধীরে অমিয়ের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে উঠত। সে দেখতে পেত—তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্তর নয়। সেনগুপ্তর পরনে কালো শর্টস্, গাল টুকটুকে গঞ্জী, দস্তানা পরা দুটো হাত থাবার মত উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দুটো আলপিনের মত চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকীপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোন শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনদিন দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে কিংবা হয়তো কোনদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দুজনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এরকমই কোন তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরো অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূরে থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরীঘাট, জেটি, তার অতলান্ত জল···অমিয় মুখে তোলে—কিছু বলছেন সেন?

—একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী? আমি কোন ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি জার্মানীতে গিয়ে চিঠি দেব?

অমিয় একটু হাসে—ল্যাংগুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোণ্ট বদার।

—নাইরি! তাহলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

—চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন—তিনটে—ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মত অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোন গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ্য করে না। কলতলায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ভাবেই অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা

জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকীপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে থেমে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মত ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনদিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি? অনুভব করেনি তার শিহরণ, বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা? লক্ষ্য করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মত শ্বেতবিন্দু? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত ঘরের মত নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে, চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমিয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে—তুমি কে?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে অনুর বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি-পাঞ্জাবি কোনদিনই পরে না অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোনদিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে বের করেছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসী পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে—

ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এরকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ঘরে, ও-ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে সপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘাড় দেখে কেবল বলেছিল—বড় দেরী হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল? একসঙ্গে তারা বেরলো, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়ে-বাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়-ঝাঁপে পাঞ্জাবির ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে-মুচড়ে, ঝোল-তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই সপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ্য করেনি। ট্যাক্সিতে হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং-টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে একবার চেয়েছিল অমিয়। বলেছিল—হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখনি।

হাসি চমকে বলল—কৈ?

অমিয় হাসল—দেখছ না?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল—নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পর।

—পরি! কবে পরেছি?

—পরনি? হাসি একটু ভেবে-টেবে বলে—গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরোছলে না?

—না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পাল্টানোর সময় ছিল না।

—তাহলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে?

—না।

—তবে নিশ্চয়ই দীপালীর বিয়ের সময়ে—

—তাও নয় হাসি।

—কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি

দেখেছি।

—না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল দেখি, কেমন দেখাচ্ছে। বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না!

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এই সব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়। মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে একবার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখ সিংহ বসে আছে, তার চারদিকে কয়েকটা সিংহী ঘুর-ঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গড়-গড় শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যই করছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ংকর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকারা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল রোডে, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরী করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশী করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বার বার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মত দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালবাসেনি।

গির-এর প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী, নির্মম! মানুষেরাও কী নয় সেই সিংহের মত! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—পুরুষ এরকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে

ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বত্থচারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারাদিন হাসির কথা ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা, তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর বিলেত-ফেরৎ এঞ্জিনীয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিকদের কথা, তার মনিপুরী নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসি মনের মত সাজত, হাসিকে খুশী করার জন্য সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত—সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্, বিজনেস্ ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ী কিনেছিল গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে নেয়নি অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত—পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে! তারপর মুখের শ্বেতবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনো গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত, তখন থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ্য রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ্য রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি-এম-ডি-এর একটা বিল পেমেণ্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরীতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিট্যাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরো তিনটে বিল-পেমেণ্ট। সেগুলো টের পেতে আরো অনেক দেরী হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তার ভীড়ে আজও

সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, কালো শর্টস, লাল টুকটুকে গেঞ্জী, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মত দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফনা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মত শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনদিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ঐ কাল্পনিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াইয়ে যে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়; কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কী? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু-একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি-বারান্দার তলায়, এক ভীড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির বরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মত জল ভেঙ্গে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চারদিকের কাচের টুকরোর মত ধারালো, রঙীন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই ভেঙে স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রীজের ওপর, ধনুকের পিঠের মত সম্মুখ আড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ঙ্কর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভাল লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগদিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চারিদিকে

বহু দূরের বিস্তার ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উৎরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মত ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস পাগল বৃষ্টির ফোঁটা খরশান। স্কুটার টাল খায়। ডানদিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মত বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র?

অমিয় উৎরাই ভেঙে নেমে আসে। বড় রাস্তার ওপর ঐ দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পর্দা। বাইরের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহুদূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু-ধারে গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক-আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলো জ্বেলে বসে আছে দোকানী। এই সব রাস্তা পার হয়ে অমিয়র স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হাল্কা স্কুটার, ভেঙ্গে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল্ ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনীতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো-মোজা ভিজে যায়। লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে ফাঁকা জমিতে দু একটা ঘুমন্ত বাড়ী চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে, স্কুটার থামিয়ে হেডলাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডানধারে ইঁট-খোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইঁটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দুধারে এই বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই

জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতরে ঢুকে যায় সে। চারিদিকে বাড়ীঘর নেই। আলো নেই। কোন মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকা বাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কল কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে-স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আশা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটার থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি-ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়—খুড়ীমা। ও খুড়ীমা!

দরজা খুলতেই একটা হ্যাবিকেনেব ম্লান, হলুদ আলো দেখা যায়।

কে?

অমিয় বারান্দায় উঠে আসে। একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে বোকা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদির ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

—ভাসান আমি অমিয় মামা। খুড়ীমা কেমন আছে?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে—অমিয়মামা। তুমি এই রাতে, কী হয়েছে?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে! এত রাত্রে মানুষ বড় জোর বাড়ী ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম-ভাঙা বুড়ি গলায় জিজ্ঞেস করে—কে রে? কে এল রে ভাসান?

—অমিয়মামা।

—কে অমিয়?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে—ভিতরে এসো

অমিয় মামা। দিদিমা ভাল নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা-প্যাণ্ট থেকে যতদূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘর খানা দেখে। হ্যারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়িমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়িমার পাখা নড়ত নির্ভুলভাবে।

—কে এলি রে? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

—আমি খুড়ীমা, অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়ীমা, গোঁজা মশারির এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিট মিট করে তাকিয়ে বলে—অমিয় মানে মেজঠাকুরের ছেলে?

ভাসান ধমক দেয়—তো আর কে অমিয় আছে?

—হ্যারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয় কাছে আয়, দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো?

ভাসান বলে—শার্টটা ছেড়ে ফেল অমিয়মামা। ইস্! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে—খুড়ীমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

—তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি? কী হয়েছে তোর? খারাপ খবর আছে কিছু? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—তুমি কাকার থেকে চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে?

মশারি তুলে খুড়ীমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে—তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়সের হিসেব তুই কি জানবি? মেজঠাকুরের বুড়োবয়সের সন্তান তুই! তোর জন্মের সময়ে মেজোঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, তোর মা-র চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

—তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা।

কাছে আয় তো দেখি, কী রকম ভিজেছিস !

খুড়ীমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মত চেপে চেপে ধরে তার শরীর দেখে।

—তুই কী পাগল ? এমন কাক-ভেজা কেউ ভেজে ? ভাসান, জামাকাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না দিলে ও মরে যাবে।

—খুড়ীমা, তুমি কেমন আছ ?

—কী জানি ! ডাক্তার বলেছে, ভাল না। কাপড়ে-চোপড়ে হেগে মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপা ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

—আজ তো এলাম।

—এটা কী রকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহুকালের পুরনো ঝগড়া শত্রুতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে ? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল ? ও ভাসান—

—দিই।

—তাড়াতাড়ি দে।

—খুড়ীমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা-কাপড় ছেড়ে কী হবে ?

—তোর বর্ষাতি নেই ? ছাতা কিনিসনি ? ওরে তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখীকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস ? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে এইজন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

—কেন এসেছিস ? আমাকে দেখতে ? আমি মরে গেলাম কিনা দেখতে এসেছিস ? বলতে বলতে খুড়ীমা একটু কাঁদে। বলে

—সত্যিই খুড়ীমাকে ভালবাসিস অমিয়? তোর বৌ বাপের বাড়ীতে গেছে নাকি? বাচ্চা-কাচ্চা হবে না তো?

—না।

—তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ! কী করিস তোরা? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়োবয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না। এখন হইয়ে ফেল।

—চুপ কর খুড়ীমা।

—আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর দোরগড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে—মামা বাড়ীতে থাকে না, মামীকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামীকে আবার চেনার কী আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

—চুপ কর, তুমি চুপ কর।

—চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

—তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী আর পাখী। কেটলীতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী, অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হ্যারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

—আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে. রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভানা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে। তুই কেমন ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর দুই হাত মেলে ধরে খুড়ীমা। গরম হাত দুখানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

—রাখু, ভাত চড়াসনি?

—না তো! মামা কী খেয়ে যাবে?

—খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

—আমি খাব না খুড়ীমা।

—কেন খাবি না? বৌ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

—হ্যাঁ।

—পাখী, তুই একটু হাত গরম করে শেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

—কথা বোলো না।

—বলব না! কেন? কাছে এসে বোস আরো। তোর বৌকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে—দিয়েছিলে। নাকছাবি।

—ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেবো। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

ঢাকুরিয়া।

—সে কী অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বৌ, কী-নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

—তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

—তাড়া কী সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনো এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে পরের মেয়ে বৌ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কী মা হতে পারে না? কেন এসেছিস অমিয়?

—খুড়ীমা, তুমি আমাকে গল্প বল।

—কিসের গল্প শুনবি?

—আমার গল্প বল। আমি কেমন ছিলাম?

—তুই? তুই আবার আলাদা কি ছিলি; আর পাঁচজনের মতই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

—তবু বল।

—খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশী। আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠাণ্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব

গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙিনৌকো বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝ-দিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চীৎকার শুনে আমরা দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেচাঁচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেৎরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কতদূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এইটুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চারদিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে কিন্তু তোরা এতদূরে যে পেঁছিতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাৎ হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের!

—তুমি কী করেছিলে?

—আমি! আমি কী করব? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা-মরা দুটো ভাইবোন কেন যে ঐ বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয়?

– আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার?

—কেউ ধরার আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পাড়ে। খুব রোখ ছিল তোর।

—খুড়ীমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

—কী রকম জল?

—অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ওপার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা স্টীমার বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়ীমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে—অমিয়, কী বলছিস?

—একটা স্টীমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়ীমা একটু চুপ করে থাকে।

—খুড়ীমা তুমি এই স্টীমারঘাটের কথা কিছু জান?

খুড়ীমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে—না তো! স্টীমারঘাটের কথা কী জানব! কবে থেকে এটা দেখিস?

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে—অনেকদিন থেকে। এক

দিন ঘুমের মধ্যে ঐ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই আবার সেই স্বপ্ন। তিনবার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভাল হত।

—বৌয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয় ?

—কেন, ওকথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

—এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয় ? বৌ বিছানায় শোয় না ? আলাদা শোয় ? তা তার এত গুমোর কিসের ? ঐ জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

—খুড়ীমা স্টীমারঘাটের কথাটা আগে শোন।

—কী শুনব ! স্টীমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু ভাতটা টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে ?

—ন'টা।

—অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জেবলে বড়রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভাল লাগছে না।

—কেন খুড়ীমা ?

—তুই কেন স্টীমারঘাটের কথা বললি ? ওসব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়ীমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে—মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না ?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়ীমা ঘুমচোখে বলে—ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয় ঠাণ্ডা লাগবে না ? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে—উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।

—ওতে কি শুকোয় ? সেলাইয়ে জল থেকে যায়। স্টীমার-ঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয় ?

—তুমি তো শুনতেই চাইলে না।

খুড়ীমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে—ছেলেবেলা

থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয় ? তোর মা-বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায় ! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি-নাতনী—এ সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত-বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারো নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি, মানুষের আপনজন কে-ই বা আছে! তুই কেন এসেছিস রে অমিয় ?

—তোমাকে দেখতে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়। খুড়ীমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে—ষ্টীমারঘাটের কথা কেন বললি ? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধু ধু বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দূরে একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল···সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভাল না, অনেক রাত হয়েছে !

—খুড়ীমা, তুমি ঘুমোও।

—ঘুম কী আসে। ভাসান, টর্চটা ধর। অমিয়, তোর বৌয়ের নাম যেন কী ?

—হাসি।

—হাসি ! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে ? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি ?

—অমিয় চুপ করে থাকে।

—বাচ্চা না হলে বৌ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো ? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা-কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—

—কী ?

—সেই যে কী যেন বললি ! সেই ষ্টীমারঘাট—অথৈ জল··· অমিয় সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল-মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না। আজকাল।

দূরে সিংহের ডাকের মত মেঘগর্জন শোনা যায়। গির-অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে!

স্কুটারের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল হাসি। আধো ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোন কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তার চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে একবার করে ঘড়ি দেখছে। কোন স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।

হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে উঠিয়ে রাখছে আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্ততঃ খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দু'চারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাঁদের বাঁধা রতিক্রিয়া। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে ঢোকে। জামাকাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।

ও-ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অমিয়র রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে পায়চারীর শব্দ হয়, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটা মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে—কেউ এসেছিল?

হাসি মৃদুগলায় বলে—টেলিফোনের লোক। কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

—টেলিফোন। একটু অবাক হয় অমিয়।

—বলল, তুমি তিনবছর আছে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এতদিনে মঞ্জুর হয়েছে।

—টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব?

হাসি একটু হাসে। বলে—লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত

কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

—আমার কোনো কথা নেই।

—কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা স্টীমার ঘাটের কথা বল।

—সে কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল?

—এক বুড়োমত ভদ্রলোক, তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

—চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেন নি?

—বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেকবার বললেন। আমি বলেছি—যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্য।

—আর কিছু বলেন নি?

—না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেন নি।

—বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবি নি।

—দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। তাঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভাল না।

—কোথা থেকে দেব?

—তুমি আমাকে যে সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টীলের আলমারীতে আছে। দরকার হলে নিতে পার, আমি তো নিচ্ছি না।

—আমাদের বংশের কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি।

—তা হলে কী করবে?

—বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ্য করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাটকরা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এসব বোঝা খুব মুশকিল। ঐ দেহটির স্বাদ সে বহুবার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে-কানাচে আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কতবার সে বেষ্টন করেছে ঐ শরীর, মথিত হয়েছে।

তবু ঐ শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুনটাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরী করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গী বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোমার ওজন কত?

অমিয় একটু থমকে থাকে? প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—কী বলছ?

—তোমার ওজন কত?

—কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে?

—কী জানি।

—তুমি ওজন নাও না?

—না।

হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে—আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায় নি। কলকাতায় আমাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে।

—থাকবে। তাতে কী?

—আমি দিদি-জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। গেলে ওঁরা নানারকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাই নি।

—যেমন তোমার ইচ্ছে।

—খুশির বিয়ের তারিখ এসে গেল! রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!

—প্লেনে চলে যাও।

—তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।

—দেব।

—তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

—প্লেনের ভাড়া কত?

—দু-তিনশো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?

—ভাল নয়।

—খুব খারাপ?

—হ্নঁ।

—কী রকম খারাপ?

—উঠে যাওয়ার মত।

—কেন?

—হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।

হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে—দরজার পর্দাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।

পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।

—জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।

—তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে? সত্যি?

—সত্যি। সুখের পাখী এবার উড়ে যাও।

হাসি চুপ করে থাকে।

—ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?

—না।

—কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাও নি।

—জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। কথাবার্তা বন্ধ হয় নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমন কি কোর্ট-কাছারিও কথা ভাবছি না।

—তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?

—না।

—তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?

—কেন?

—ফ্রিলী কথা বলতে পারবে?

—আমি বাসা থেকে ফোন করছি।

—বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?

—আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ ক্যানেকশান দিয়ে গেছে।

—ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—হবে হয়তো।

—ফোন কোম্পানীর মত বেরসিক দেখিনি। যখন পাখী উড়ে যাচ্ছে তখনই এল ফোন। এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!

—কি বলছিলেন বলুন।

—ডিগবয়ের তেল কোম্পানীর সেই এঞ্জিনীয়ার, সে এখনো বিয়ে করে নি শুনেছি। সত্যি?

—সত্যি।

—সে কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি?

হাসি একটু দ্বিধা করে বলে—না না।

তবে কী করেছিল?

একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বার বার একটা প্রশ্ন করেছিল—আমার কী দোষ? আমাদের অপরাধ কী? আপনি কেন এমন করলেন? আরো লিখেছিল, যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে—জামাইবাবু, আপনি কি শুনছেন? আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস-ও যে শোনা যাচ্ছে না?

—শুনছি। বল।

—সে এই কথা লিখেছিল। আরো লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল, সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার স্যুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম··· শুনছেন?

—শুনছি।

—কালো হলেও তো আমি সুন্দরী-ই! তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নূপুরের মত বাজত।

ও-পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।

—কিছু বুঝলেন জামাইবাবু?

—বুঝলাম।

—কী ?

—তুমি আর ফিরবে না হাসি।

ও-পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।

—হাসি, স্টীমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও জায়গাটা ডেঞ্জারাস।

হাসি চমকে উঠে বলে—স্টীমারঘাট! কোন স্টীমারঘাট ?

—বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না ?

—ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।

—একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ওপারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

—ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু ?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে—ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি! কিছু ইঙ্গিত করছ কি ? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পেঁছোতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পার।

—আমরা ভাগ্যবান।

—দেখা যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

—এখোনো সাত আট দিন সময় আছে, এ কদিন কী করবে হাসি ?

—কী করব! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব।

—কোথায় যাবে ?

—কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমত।

—কলকাতার আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতার ?

—কী আছে ? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙীন দোকান দেখব, আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব, কলকাতা পুরানো হয় না।

—কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি ?

কী পেয়েছি ! হাসি তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে মনে মনে বলে—কলকাতা ! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয়নি। সে আমাকে নিয়ে আরো কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

—হাসি, ফোন কী ছেড়ে দিয়েছ ?

—না তো।

—তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না ?

—শুনছি। বলুন।

—এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

ও-মা ! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব না কেন ? এইতো ওর পিসতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ-ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিসপাড়া, কলেজস্ট্রীট, পার্কস্ট্রীটের রেস্টুরেন্ট দেখে বেড়াব দুজনে। জামাইবাবু, আপনি কী ভাবছেন আমরা প্রেজুডিস আছে ? একদম নেই। আমরা দুজনে কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, কখনো ঝগড়া করি না। এমন কী মাঝে মাঝে এক বিছানায়···জামাইবাবু শুনছেন ?

—কী ভয়ংকর !

—কী ?

—তোমার নিষ্ঠুরতা !

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে বেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি। বাড়ি। উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়ীটার বুক, কী পাথুরে গড়ন ! দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চূড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি, তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

—বাব্বাঃ ! আপনমনে বলল সে। হেসে আঁচলে একবার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চারদিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধুলিকণার মত লাগে তার। কান পাতলে—

পাতালের খরস্রোতা নদীর গর্জনের মত উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়! কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে! কলকাতা—তার চারদিকে উষ্ণ কল্লোলিত কলকাতা!

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা! ময়দানের দিকে ট্রামলাইন পেরোলে দেখা যায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পরে আছে—যেন বা যে খুশী নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে ঘাস, পাতা। নির্জনতা। হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। ফর্সা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুল্পী, ঘন বড় চুল, চৌকো মুখ। রঙীন চোখুপওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই-রঙা সরুচাপা প্যান্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বক্‌লশে একটা ইস্পাত রঙের ইংরিজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজীর ঘড়িতে মোটা সোনারঙের চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ্য করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্যভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার বুক, চোখ। চোখই বেশী লক্ষ্য করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটুও ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর এক পা। আর এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা লক্‌ লক্‌ করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে। বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে

বলে—আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদ্যত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মত দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চারদিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ঐ আঠারোতলা বাড়িটার চূড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু ইঙ্গিত করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে বলে এরকম কত মানুষ কতবার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করেছে ইঙ্গিতে, কীটপতঙ্গের মত সব ছোট মাপের জীব। কলকাতার গায়ে উড়ে এসে বসে, আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূর দূর হেঁটে যায় হাসি। কখনো ট্রামে ওঠে, কিছুদূর যায় আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চকিতে মানুষের চোখ ঝলসে উঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগবতীর গম্ভীর নিনাদের মত কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট! হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল। না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার শুরু। হাসি ফিরে আসে।

সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লভ্যাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনোটার অভাবেই ব্যবসা আটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তরতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা নাকি। ছিলনা— অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরোতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ।

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায় না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবী হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টুরেণ্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনো কখনো। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এসেছে দেশ থেকে।

চা টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করল না। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ্য করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালী মুটে মজুর রিক্সা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে রাজেন। এক রাত্রির বসবাসের জন্য মাথাপিছু দুচার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জেবলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড বিজনেসের জন্য বিস্তর বকাবকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁড়াগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টন্ টন্ করে। রাজেন আজকাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোন কোনদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু

অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন!

—অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম! রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

—শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

—খুব ভাল। টাটার ইঞ্জিনীয়ার, তবে দাবী দাওয়া অনেক।

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন—মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরীব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

—পিসেমশাই আপনার কত দরকার?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয় একটু নীরব থাকেন। তারপর আস্তে করে বলেন, দরকারের কি শেষ আছে অমিয়! প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার কর্জ করেছি। এখনো দু তিন হাজার কম পড়বে। আলমারীটা এখনো কেনা হয় নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশী পড়ে গেল।

—ঠিক আছে, আমি হাজার খানেক দেবো।

—দিতে তোর কষ্ট হবে না তো?

—কষ্ট কি পিসেমশাই? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার কথাই ছিল।

পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন—কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবেনা—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নীচু স্বরে বলল—পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে আমি দেবো, সে কথা তো রাখতে পারলাম না পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে।

বললেন—তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

—আচ্ছা পিসেমশাই।

—শোন, বৌমাকে বিয়ের দুএকদিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবি না? বিয়ের কাজকর্ম মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে!

হাসিকে বললে হাসি রাজি হবে কিনা তা কে জানে। তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল—সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বৌমাকে বলে আসতে পারতেন।

—লজ্জা করল। বৌমা তো আমাকে খুব ভাল চেনেন না, দু এক বার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবী কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হল না!

অমিয় লজ্জা পায়। বলে—তাতে কী?

—সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নতুন বৌয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সেরকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বৌমা ভারী ভাল হয়েছে! পরিচয় দিতে কত যত্ন আত্তি করল। আজ কালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিল না।

—অমিয়।

—বলুন পিসেমশাই।

—পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

—দেখি।

—দেখি টেখি নয়, কাজ করার লোক নেই।

—আচ্ছা।

—ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকালো, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে। একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা একবার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দুটোয় বেশ তীব্র চাউনী। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—টাকা!

অমিয় হাসে। উল্টো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুঁকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বললে—

টাকা।

ভক্ত দুজন কী বুঝল কে জানে। জ্বল জ্বল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চারদিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরোনো ফ্যান থেকে একটা ঘট ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনো তার আছে। বেশীদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় ততদিন তার। আহমদ একটা মফঃস্বলের লোককে জাঙ্গিয়া গছানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে দেখে নিচু গলায় বলল—'সাহা ব্রাদার্স' থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটেব' র আসবে।

অমিয় উত্তর না দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউণ্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখ চেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশী চেনা। এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরো একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে! সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউণ্টারের পুরোনো কাঠ গাঢ় খয়েরী রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশন গুলো নড়বড় করে।

কারেণ্ট অ্যাকাণ্টটা অমিয় বহুদিন হল বন্ধ করে দিয়েছে! সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এণ্ট্রি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে!

টোকেন ইস্যু করার কাউণ্টারে একসময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপনমনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না।

কাউণ্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকাউণ্ট লেজার খুলে দেখে বলল—না, হাজার টাকা তো নেই। দুশো পঁয়ত্রিশ

টাকা আছে !

অমিয় যন্ত্রের মত শব্দ করে — ও।

আরো দুটো ব্যাংকে অ্যাকাউণ্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশী নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে। অনেক পেমেণ্ট বাকী। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবতঃ পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা থেকে এরকম হয়।

দুটো বাজতে আর খুব বেশী দেরী নেই। বেলা দুটোয় সব জায়গায় টাকা পয়সার ওপর ঝাঁপ পড়ে যায়।

ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে।' ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহুদিন ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ঐটুকু ভালবাসা দেখাত।

দুশো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিল না অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশানের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে। ময়লা ঘোলা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানিং একটু মাংস লেগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালই নীপার। টসটসে মুখ বলতে যা বোঝায় তাই। বড় বড় দুখানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশীর ভাগ সময়ে। রঙীন পরলে হাল্কারঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনো করেনা। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশী।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে, বা অ্যাকাউণ্টের টাকার অংক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশীক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয় ?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয় ? মাঝে মাঝে

একটু আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। অনুভূতিশীল। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত—একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃদু অহংকারী হাসি হেসে বলতো—কে না জ্বালায়! জ্বলে যাচ্ছি। দিন কি আছে...বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশী স্বাস্থ্যবতী তাঁর পছন্দের নয়। নীপা রোগা ছিল, আবার রুগ্নও নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দুটি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কব্জীর হাড় তেকোনা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকত না। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে কখনও নীপা ঠাট্টা করে কথার উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশীর ভাগই ভাল হয় না। যেখানে তিনচারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরো মুস্কিল! কিন্তু নীপা ছিল অন্যরকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনো ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধুম পড়ে যায় তখনো নীপাকে বরাবর নীচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে অমিয়। দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা-প্রশ্নের উত্তর দিত। একদিন দুজন অল্পবয়সী ছোকরা স্রেফ ইয়ার্কী করতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু মিনিটের বেশী লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউণ্ট দেখে তখন তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দুটোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউণ্টের নাম মিলছে না। ছেলে দুটো সাহস পেয়ে আরো কিছু ইয়ার্কী করে একজন বলে—তাহলে অ্যাকাউণ্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাটাকাটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে—এরকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনো হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক্-ঐতিহাসিক ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনেপড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভাল লাগত। ঘন ঘন তখন ব্যাংকে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও সে নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত—কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেণ্ট পেতে অনেক দেরী হয়েছে।

নীপা সে অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলত—রোজ তো আসি। এক আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ ধরনের কথা নীপা একমাত্র তার সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাংকের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে একদিন। গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিটের একটা দোকানে নীপা পুজোর জামাকাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিস পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল—এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সেই সহৃদয়ভার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছা পেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল—দেখুন তো এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফর্সা। অমিয় হেসে বলে—নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যতবার বলে—এবার যাই, কাজ আছে। ততবার নীপা বলে—দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে পারে না। পুরুষেরা অনেকে পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা হয়ে বলল—এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে—বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি!

—ও বাবা! স্কুটার! পড়ে টড়ে যাবো, কখনো চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টুরেণ্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সঙ্কোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুতভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্যন্ত নীপাকে পৌঁছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জ্বেলে থেমে থাকা স্কুটারে বসে দেখল নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেকবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়ত হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিষ কিনে সেসব জিনিষের কথা ভুলে যায় দুদিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর। হাসিটা তেমনি সহৃদয়তায় ভরা দেখে ভিতরে একরকম ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা। চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

—কী খবর? আবার বুঝি জ্বালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল—না। কোনদিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখিনা। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

—কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ-ছাড়া কী করে দেখবেন।

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে—অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশে পাশে ব্যস্ত সমস্ত লোকেরা যাচ্ছে আসছে। নীপা বলে—বলুন না বাবা কী কাজ আছে। কোনো চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি না কি!

—ওসব নয়। অ্যাকাউণ্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিই না অনেকদিন।

—সে তো জানি।

—কী করে জানলেন?

—আপনার অ্যাকাউণ্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে—আপনি আমাকে মনে রেখেছেন।

—মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েণ্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে।

অমিয় একটা বিষ বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে—কোন পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিছু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময়ে কলকলাত দুজনে। সেসব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দুমাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোনো দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন অমিয়র অ্যাকাউণ্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে—আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

—হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে—হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াবো।

—তাই বা কেন! কোনো খাওয়া কি পাওনা হয়েছে! নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল—খাওয়ার জন্য নয়।

—তাহলে ?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে তার কোনো বোঝাবুঝি তৈরী হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইংগীতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশবস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে—আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন ?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বলে—আর যাই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে—আমার বুঝি কাজ নেই ! কী দরকার বললেই তো হয়।

—আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন !

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল—চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো ! আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী !

—এমনি, কৌতূহল।

—আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আনঅফিসিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে—চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছে বরবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেত। নীপা পালাল না হাতটা তুলে তাকে থামতে ইংগীত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে, একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোট ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে এসে বলে—আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাবো।

অমিয় অবাক হয়। বলে—বাড়ি যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে!

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে—আজ আপনাকে পেঁছে দিতে পারি। যাবেন?

মুখ নীচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে—না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাবো। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ-এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

—ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনো জানেনা। শুধু ঘড়ির দোকান, স্বামী, গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দগুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

—আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া—এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে। কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিস নয়—তা ভেবে এক ধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল—শুনুন।

—কী?

—আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনদিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে—জানাটা কি দরকার ছিল?

—আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

—না।—তবে আপনার বৌকে দেখেছি। খুব সুন্দর বৌ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে চেয়ে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আমরা কেউ কারো সম্পর্কে জানলাম না কেন?

নীপা এ কথার উত্তর দিল না। কারণ, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল—স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেবো।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধ হয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

—আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশ পাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলিউশনে। রেলগাড়ির মতো দ্রুত বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতিশীলতার মধ্যে তারা ধীরে হাঁটে অমিয় বলে—আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কী বলছে।

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ও!

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট পার হতে হতে অমিয় বলে—আমি ভাল নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা ভেবে?

না। অমিয় বলে—আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু সে কথা কখনো বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায় মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চারদিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে। প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষবাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাষ্পময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে—দেখা হবে। আবার।

—কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে-টক্কার মতো মৃদু গলায় বলে—একটা স্টীমারঘাট আছে। সেইখানে সকলের দেখা হয়।

—কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

—ধু-ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহুদূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর জল। একটা ফাঁকা শূন্য জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে, দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙে চুরে গেছে। আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধার। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবটা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা জানে।

স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চারদিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে পা। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।

টাপে টোপে প্যাণ্ডেলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে। একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যাণ্ডেলে। কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো-কাটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড় করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যাণ্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব-শেষের বীভৎসতা চারদিকে।

বর-বৌ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো আর কেউ বাসর জাগে না। প্যাণ্ডেলের এক কোণে এড়নো যজ্ঞের ছাই পড়ে আছে, দুটো রঙ করা চিত্রিত পিঁড়ি এখনো তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙীন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এরকমভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।

পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা-টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ি শুনে বলল—দূর মশাই, কে-বি ফিট করুন না।

—কে বি কি ?

—কাবুলে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু হাজার লিখে দিতে হবে।

—সে কী ?

—ভয় নেই। আসলে ওরা লাইসেন্স-ওলা মানি লেণ্ডার, গভর্নমেণ্টের বেঁধে দেওয়া সুদের বেশী আইনতঃ নিতে পারে না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেণ্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুণের বেশী। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু'হাজার টাকার ওপর আর যদি সুদ ঠিক মত দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তাহলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাক্‌ল করবেন।

আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিসে মশাইকে কথামত দেওয়া গেল। রেখার বর ভালই হল। টাটার এঞ্জিনীয়ার। দু হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারী, সিঙ্গল খাট দুটো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গয়না। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশবাতাস চাঁদ-সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। অমিয়র জন্য সারাদিন হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন—ভাবলাম তুই বুঝি আর এলি না! ভয়ে তোর অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ খবর শুনি!

অমিয় একটু হেসেছিল।

হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে—এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চল।

তাই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে এল হাসি। মেয়েদের দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।

রাস্তায় পার্ক করা শেষ দুটো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল—অমিয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

—কী সোনাদা?

—তুই বড় পাজী অমিয়, চিরকাল পাজী ছিলি।

—কেন?

—আমার বয়স হচ্ছে না রে? এই বয়সে মানুষ একটু গুছিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ সুখ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে—ঠিকই তো।

—তবে তুই কেন আমাকে স্টীমারঘাটের কথা বলতে গেলি?

—কেন, কী হয়েছে?

—অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজী। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন যখন-তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে—স্টীমারঘাট—স্টীমারঘাট।

শেষ মার্ক টু-টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যাণ্ডেলটা একদিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো-কাঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যাণ্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠাণ্ডা

দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মত খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দুগালে পানের ঢিবি। তিনি পিসে-মশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন—পুরুতরা আজকাল বড় শর্টকাট শিখেছে বেয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল! আমার বিয়ের সময়ে চারঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে ঢুলতে দেখে আমি চিমটি কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে—তুই কিছু খাসনি অমিয়?

—না। বমি-বমি করছে।

—খুব খেটেছিস। সোমাকে বলি তোকে একটু সরবৎ করে দিক।

—না, আমি এবার চলে যাই।

—অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল? কিছু দোষ ধরেনি তো?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন—আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভীড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভীড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে—অমিয়, কী খাবি?

—কিছু না।

—আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ ঘরে একটু ঝোল-ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

—হাসি কোথায় সোমাদি?

—ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

—রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

—তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী? তোকে একটু দৈ-মিষ্টি এনে দিই!

—সোমাদি, তুমি এত কষ্ট কর কেন?

—কিসের কষ্ট?

—খুব খাটো তুমি, টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি?

—তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

—সোমাদি, একটা ষ্টীমারঘাট—

—অমিয়, আমার এখনো অনেক কিছু করা বাকী, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেকদিনের শখ, একটা রেকর্ড-চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়, তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি ?

—সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

—কী বলছিলি ?

—একটা ফেরিঘাটের কথা—

—অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভাল করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব ? জানিস তো, গত চৌদ্দ-পনেরো বছর আমার চাকরি ওর ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা আংটি দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভাল করেছিস। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলছেন।

—সোমাদি—

—শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ঐ চাকরিটার জন্য। এ চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন খারাপ লাগে! একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড-চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব, উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব—গান হবে—দুঃখের গান—বিরহের গান—শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো—আর মনে পড়বে···কী মনে পড়বে রে অমিয়···?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তুমি তো জানো সোমাদি···

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে—জানিই তো, জানব না কেন ? মনে পড়বে···

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো

দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন—আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

—জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভাল ছেলে।

পিসেমশাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

—আসব না কেন!

—কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নীচু করে বলে—কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে মাঝে একটা ফেরিঘাটের কথা বলছে—

—ফেরিঘাট! কিসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

—স্টীমার বাঁধার জেটি, জল···

—ওঃ। পিসেমশাই হাসেন—স্টীমারঘাট মনে পড়তেই খালাসীদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনো। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ঐ গন্ধ যে কী ভাল লাগত। বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সর্ষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল—তেমন আর কখনো কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? নাকি···

—কী জানি! আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত···কালো ছোট্ট একটা জেটি···নির্জন···বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল···আবছায়ায় জল দেখা যায়···সেকী জল···অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে···

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকী যে ক'টা দিন আছি। অমিয়, রাত হল রে, বৌমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা, এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না?

—না।

—অমিয় আর দেরি করিস না। সোমা, বৌমাকে ডেকে দে।

—দিই।

—বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয়? মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু-চারদিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না···

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ। তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেণ্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু-খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। একবার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদুটি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলসে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে—আরো জোরে চালাও না।

—কেন?

–জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী!

–হাসি, আমার স্কুটারটা পুরনো হয়েছে। স্পীড নেয় না।

—পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে, এই স্কুটারে···

– জ্যোৎস্না ফুটেছে কেমন, দেখছ?

—হুঁ।

—ঠিক দুধ-ভাতের মত জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

—হাসি তুমি কবে যাচ্ছ?

—তেরই।

—তোমার যদি টাকার দরকার থাকে···

—সামনে ওটা কী, ঐ উঁচু মত?

—গড়িয়াহাটা ব্রীজ।

—ওমা! ওর ওপর দিয়ে তো রোজ যাই আসি, কৈ অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টিলার মত দেখাচ্ছে দেখ। চা-

আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম—একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

—হুঁ।

—তোমার স্কুটারটা পচা। আর একটু জোরে চালাও না।

—কেন ?

—আমার স্পীড ভাল লাগে।

গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রীজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। 'খুব বেশীদূর নয় আর' সে মনে মনে তার স্কুটারকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিঁড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

—ব্রীজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে ?

—হাসি, অনেক রাত হয়েছে।

—ক'টা বাজে ?

—বারোটা চল্লিশ।

—হোকগে। তুমি দাঁড়াও।

ব্রীজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশী। আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিংয়ের কাছে চলে যায়। ডেকে বলে—দেখ, কত দূর পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনো দেখি নি।

অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না-ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধ চোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রীজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তাহলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে স্কুটার এবং অমিয়কে না দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রীজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।

না-ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মত খসে পড়ে তারা।

অমিয় অপেক্ষা করে।

একদিন যায়। দুদিন যায়।

দীর্ঘ টেণ্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয় নি।

—বাগচী। কল্যাণ ডাকে।

—উঁ ?

—আপনার কি কিছু টাকার দরকার ?

অমিয় হাসে।

—রাজেনের কাছে আমি আরো ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।

—অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জী।

—আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোন পাত্তা পেলেন ?

—না।

—কত টাকার বিল পেমেণ্ট নিয়ে গেছে ?

—প্রায় সাত হাজার।

—ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন ?

—কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—

—কী কথা ?

—বলব···

অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ। বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, থাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মত দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।···ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠেছে জল—অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মত জল। কালো মহা আকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধু ধু করে সাদা হাড়ের মত। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে।

—মুখার্জী আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করব।

—কী ?

—আমার স্কুটারটা।

—তা কেন বাগচী! এখন আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। প্রেজেণ্ট সুসময়ে করবেন।

—এই ঠিক সময় মুখার্জী। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।

কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে—যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।

—না মুখার্জী আমাদের বংশে কেউ কখনো ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভাল, সুসময়ে দেওয়া হয় না।

কল্যাণ চুপ করে থাকে।

—রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী, দরকার হলে নেবেন।

—আচ্ছা।

টেণ্ডার সীল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে চারদিকে পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

—লাহিড়ী।

—উঁ।

—টেণ্ডার দিয়ে গেলাম।

—আচ্ছা। দেখব।

—লাহিড়ী, প্যাটরসন কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করে ?

লাহিড়ী হাসে। বলে—ওসব রোমাণ্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমত রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম ?

—দিয়েছি।

—ঠিক আছে।

—অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

—বাগচী।

—উঁ ?

—ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।

অমিয় হাসে। বলে—কেন ?

রজত হাই তুলে বলে—কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

—চেয়ে থাকে কেন ?

—বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানী যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালী মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

-- কবে যাচ্ছেন ?

—হরি সিং-এর সঙ্গে কণ্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

—আমাদের একা লাগবে।

—জানি। আফটার অল উই ওয়্যার কমরেডস্। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না ?

—ভেবে দেখি।

—সেনগুপ্তকে যদি কখনো খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক্ ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

—বাগচীবাবু।

—জানি মিশ্রিলাল।

—আপনি তো আর কোন অর্ডার পেলেন না! বিজনেসের কী হবে ? আমি ডুবে যাবো না তো !

বোধহয় দূরে কোথাও মেঘ-গর্জনের মত একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্সির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘ নেই, তবুও শব্দটা কোথা থেকে শোনে অমিয় ? একবার চোখ বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ ডাকে—মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে—ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে, হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা-থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে! মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে—বাবু, আপনার গাড়ি!

—দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেণ্ডারের খসড়া তৈরী করে। সে সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে, জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোন কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে—বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে বেরোবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভাল লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোন কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সীল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

—কবে ফ্লাই করছেন সেন?

—বলিনি আপনাকে? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

—বাঃ! ভাল খবর।

—বাগচী, ইউ আর সাফারিং টু মাচ্।

—ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

—পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।

—ঠিক দেখা হবে একদিন···তখন? অমিয় হাসে।

—বাগচী যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে

পারি।

—কী রকম ব্যবস্থা?

—জব্ ভাউচার। তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।

অমিয় হাসে।

কখনো কখনো শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে তার শরীর, পঞ্জরসার দেহ, পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এরকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী-প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।

তারপর টাইপরাইটার টেনে নিয়ে বসে।

—আপনি বার বার কেন একটা স্টীমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু?

—আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনো শুনে নিও।

—কী করে শুনব! আমি কাল চলে যাচ্ছি।

—শুনলে ভাল করতে।

—কেন?

জামাইবাবু টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।

—হঠাৎ একথা কেন?

—কী জানি! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে···

—কী?

—স্টীমারঘাট···তুমি সাবধানে যেও হাসি। গঙ্গার ওপর ব্রীজটা যে কবে ওরা শেষ করবে!

—আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, স্টীমারঘাটের কথাটা আগে বলুন। কোন স্টীমারঘাট?

—ফারাক্কা।

—না, ফারাক্কার কথা আপনি বলছেন না।

জামাইবাবু চুপ করে থাকে।

—বলবেন না ?

—তুমি অমিয়র কাছে শুনো।

—ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন ? ও অনেক রাতে ফেরে খুব সকালে বেরিয়ে যায়।

—কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না ?

—বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।

—তবে আর সময় হবে না।

—কীসের ?

—স্টীমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি···

হাসি রিসিভার রেখে দেয়।

পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।

—হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি জরুরী দরকার।

একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে—বাগচী বলছি।

—শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

—কী কথা ?

—তুমি আমাকে একটা কথা কোনদিন বলনি।

—কী ?

—স্টীমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। একবার আমাকে বলবে ?

—আমার সময় নেই হাসি।

—কেন ?

—আমি খুব ব্যস্ত।

—কেন ব্যস্ত ?

—অনেক কাজ হাসি। আমাদের সময় তো বেশী নয়।

—বলবে না ?

—সময় বড় কম হাসি।

—স্টীমারঘাটের অর্থ কী ?

—কী করে বলব। আমিই কি জানি ?

—কী আছে সেখানে ?

—কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু বালিয়াড়, ধূ ধূ বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উল্টে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেকে একটা কালো জেটি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে···

হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এর মানে কী?

—আমি জানি না। তবে মনে হয়, ওখানে একদিন সকলের দেখা হবে।

—কেন?

···

—কেন?

—কেন?

প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।

সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণী হাওয়ার মত হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভীড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রঙ, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কিনা।

অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে। থাকবে।

ষ্টীমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপ-রাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে, এ কী বাগচী?

—কী

—আপনি এখনো যাননি ?

—কোথায় ?

—কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন !

—ওঃ।

—ভুলে গিয়েছিলেন ?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

—ক'টা বাজে মুখার্জী ?

—বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

—তাহলে আর গিয়ে কী হবে !

—উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে···তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক—পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন···

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র।

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য রেল লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

—কী হল ?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে, আস্তে, চিন্তা করে করে বলল, আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

—কেন ?

—পারলাম না।

—কেন ?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে—কী জানি ! আমাকে কখনো জিজ্ঞেস কোর না।

অমিয় একটু হাসে।

আজকাল অমিয় যখন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয়

তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপর্যুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ-গর্জনের মত সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছড়ানোর শব্দ হয়। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙের বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহুদূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় ষ্টীমারঘাট এগিয়ে আসে। সে দেখে ধূ ধূ বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলস। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে এক কালো আকাশ। ঐখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকেনি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এসব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পাল্টে ফেলে। বারংবার সে ঐ ষ্টীমারঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না বুঝেও সে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

———

গেরো! শালার মিছিল।

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সীটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা-পরা মোটা-সোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানবার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনেরই প্রাইভেট গলিপথ—সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল—তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার—

—দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়ো কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলেজ ষ্ট্রীট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পেরোয় নি।

—কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার—

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দীতে বলে—তব ক্যা করুঁ! উড়কে যাঁউ!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরো নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রীটে এখন গায়ে গায়ে জমি আছে। ভিড়ের মধ্যে বদ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে, সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

—এই প্রাইভেট। গৌরহরি চেঁচাল—এটা কী হচ্ছে অ্যাঁ! এটা কি ধরণের ইন্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার

ইংলিশ স্কুল সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত।' আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইংলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পেঁছিয় নি গৌরহরি। পর পর দু'বছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা। এখনো উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝম্‌ঝম্‌ একটা শব্দ হয়। পাগল পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দুখানা নূপুর-পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ হতে থাকত। তখন গৌরহরি প্রায়ই সেই শব্দে সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত, চোখের সামনের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠত এক শূন্যতার দৃশ্য। আর কেবল সেই শব্দ আর শব্দ। রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম—দুখানা নাচের পা ঘুরছে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিচ্ছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাকসাঁইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেতে ঘুরিয়ে আনবেন—এরকম সংকল্প ছিল তাঁর। বড় দুই ছেলে সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরিশ ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেসালিস্ট—কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অবশেষে স্কুল ছাড়িয়ে গৌরহরিকে অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু আধটু। পড়ার কোনো চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল—সারিয়ে দিতে পারি, তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কিসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য সে দুটো একেবারে অকেজো

নয়। একটু কমজোরি, এই যা। নইলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালোচশমা-পরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম্‌ হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পিং পিং করে অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল—দেখছেন তো গাড্ডা! ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। জট্‌ ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে?

ছেলেটা চশমা-জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টাল-মাটাল। বলল—নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়—

—তাই করুন।

—মিছিলটা খুব বড় মনে হচ্ছে?

গৌরহরি হাসে—ভুখা মানুষ, বেকার মানুষে সমস্ত দেশ ভর্তি। তা মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কিনা।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল—ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরো মাইল খানেক আছে বোধ-হয়। এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে—মিছিল ক্রস করতে পারবেন তো?

—বলে কয়ে চলে যাবো। আমার বড় জরুরী দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে?

—তাই দেয়? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে—তাহলে?

গৌর হাসে—লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু-একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পাল্টে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক্‌ করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ঐ হচ্ছে কায়দা—

—ছেলেটা চলে গেল। ঐ রকম গোল চশমা-পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এ যুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে

কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত-পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশীদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদেরও শালা-শোয়রের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তাঁর ছেলেদের মধ্যে একেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনো কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয় নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময় বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন কলকাতায়। তখনো দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরেনি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তাঁর সহায় সম্বল। বগলাপতি একা একাই এতবড় ব্যবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বৌ আর আধা-ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালীগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুর রিফিউজি কলোনীতে। সে সময়ে খবর এল, তাঁর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ঙ্কর ভেঙ্গে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ, কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে! বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বেশী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে তিনি আরো আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ-ফিনিশ। চলে ফেরে, খায়-দায় কথা বলে—কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন—বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল —তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে, সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিবাট্টা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা

হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্ট টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝম্ ঝম্ করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—কী করবি গৌরা। কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার মাত্র দু' একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখা, সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগ-হীন হাল্কা দিন-কাটানো। কোনো কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত—আমি ব্যাটা হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেণ্ট মানুষ -আমি শালা কী করবো?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যবসা ছিল নানারকম জটিল কুটিল পথে, সেগুলো বোঝাবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন—যাঃ শুয়োরের বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারী শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতিমাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারী কর।

পুরোনো একখানা ডজ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাতো হরিপদ। রোগা-টোগা ভালমানুষ ছেলেটা। হাফ-ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল—গাড়ির যে অনেক ব্যাপার রে, ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাক্সেলেটার, গীয়ার, ষ্টিয়ারিং—তুই সব সামলাতে পারবি?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল—তা আমি কী করব? আমি কি চেয়েছি শিখতে? বগলু ছাড়ছে না যে!

আড়ালে আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে

উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা গৌরা পুরোনো আমলের ডজ গাড়িতে ভালমানুষ হরিপদর পাশে বসে অবরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তা ঘাটে।

আরে বাঃ! প্রথম দিনেই ভাল লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল না তো! কিংবা হয়তো জটিলই কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার 'পারব না' বলে মনে হল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়—দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখোশুখো হাত-পা আর মগজের ঝমঝম্ নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল তাকে। একমাসে সে গড় গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সীটে বসে তার কাণ্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন—আরে বাপ্পোৎ, খুব শিখেছে তো! অ্যাঁ! আরে বাঃ! এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে! ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয়! অ্যাঁ এ যে দিব্যি স্পীডও মারছে!

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাস চারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল—ছোটোবাবু, তুমি মাইরি এক নম্বরের টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তোমার মতো হাফ-ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনোকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কি শেখাতুম! ঠিক গ্লোলেমেলে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাস হীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি। ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারী বিজনেস্। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা কি কারো সার্ভেণ্ট? ইজ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার

কপালখানা—কেমন গড়ানে—মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দুখানা কান—দুটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ্য করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু'একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজী শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি! ডানদিকের ঐ শালা প্রাইভেটটা! কালো চশমা-পরা লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচেছ। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে—খিদে-তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হলগে টিকা-টুলির ডাকসাঁইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা—খিদে তেষ্টা সইতে নারে-ছা-রা-রা-রা-রা-রা—গুন্‌গুন করে গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের—আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখ্‌খা পার্টির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই।

একটা টেরিলেন পরা লোক জানালায় ঝুঁকে বলল - গাড়ি যাবে নাকি?

—কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে—ঐ তো শেষ—

—গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয় নি—

লোকটা একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আপনি মালিক আপনার দয়া—বলে সরে গেল।

মালিক! আলবৎ মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয় নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে। কে না জানে বিশ্বসংসারে, যে বিকেল সাড়ে চারটের চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিঙের

ওপর মাথা ঝ্ঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাব্, ওঠো, অমন হে'দিয়ে পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো—চোখ মেলে তাকাও তো বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে, দেবে, আর ধরবে এসে প্লিশবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি। জেগে থাকো হে বগল্র ছাওয়াল—

তব্ শালার ঘ্ম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া—গৌরের চা আরো কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচালঙকার কু'চি মেশানো রগরগে গরম অমলেট, আর টোস্ট। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে—খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাঁউর্টিতে চর্বি, আর শ্কনো চেতরা পাতা দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে। খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া—

তারপর র্মালে ম্খ ম্ছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে—না বে মরবি না। তোর ঠাকুর্দা খেত ম্ক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দ্র, তোরা র্পোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বিস্তর সোনার্পো ম্ক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরা পাতায় কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজ্মে দে শালা, সব হজ্মে দে— যা যাবি সব হজ্মে দিয়ে বসে থাকবি—কেউ যদি এসে 'বাতাপী' বলে ডাক দেয়—ঘাবড়াবার কিছ্ নেই, বাতাপী আর বেরোবে না—

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে প্লিশের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লীয়ার। স্টার্ট, গৌরবাব্। মাথাটা সত্যিই ঘ্মে ভরে আসছে। ঘ্ম যেন ঠিক জলের মতো—টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো-টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইণ্ডস্ক্রীন জ্ড়ে নানা অদ্ভুত দ্শ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে, সেণ্টাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক প্লিসটা ব্ড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনো বা হঠাৎ গৌর আচমকা ব্রেক চেপে ধরে বলে—আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায়

খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনো বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙীন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরা-পাতা না হলে—ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন? কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে—প্রায়ই বিকেলের দিকে ঐ অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার। আর এলেই—পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

—ও বাবা পুলুশ, ও পুলুশবাবা—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে—হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা! হাতটা একটু নামাও। আমরাও তো যাবো বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনো চা খায়নি—তার যে টিফিনটাইম—রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিশ—

অবশেষে ট্রাফিক পুলিশ হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুশ, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগার সিন্নি, বাবার গির্জেয় মোমবাতি—এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

—এই ট্যাক্সি!

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেণ্ট।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল-ওলা সার্জেণ্টটা এগিয়ে আসে। খামোখা হাত বাড়িয়ে বলে—লাইসেন্স দেখি।

এসব ফালতু বদমাইশী।

—কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেণ্টটা ধমক দেয়—বদমাইশীর আর জায়গা পান না! শীগগীর ঐ লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য—শীগগীর খুলুন—

খুলছি পুলুশবাবা, খুলছি। কিন্তু আমার যে টিফিন হয় নি। মিছিলের হুজ্জতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম—গৌরবাবু যে

হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলুশ! গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেণ্টকে বলে—ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবেতে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন—আচ্ছা চলি—

সার্জেণ্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় ঝুঁকে গৌরকে বলে ঠিকমতো নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়—আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি—

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—শালার পুলুশ যেন না ছোঁয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলুশবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো খালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে চৌরাস্তায়, রঙীন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখো খাড়া হয়ে—গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা—

—কোথায় যাবেন?

—পি জি। বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় সিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি—তবু ভাল—দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরো দূরে কোনো গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরিকে—বগলুর পোলা গৌরাকে—

রাস্তাগুলো এমন সব জ্বলে—আবছা আবছা—রঙীন রঙীন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গীর ট্রাফিক পুলিশ আড়বাঁশীতে পূরবী ধরেছে—দুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা—চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি—গৌর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে? ওঃ হ্যাঁ, পি জি! পিছনের সীটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতো? বুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী! কখন আছে, কখন নেই! সার্জেণ্টটা নম্বর টুকে রেখেছে।

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—আপনি ঠিক আছেন তো স্যার! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো!

—অসুবিধে! বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—কিসের অসুবিধে!

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কিসের!

ল্যাণ্ডমাস্টারের গভীর গদী ! চারদিকে শরতের রোদ, মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গীর মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি—তবে আর অসুবিধে কিসের অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না—কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম !

সে একটু আমতা আমতা করে বলে—অসুবিধে আর কি ? আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে ! এই বয়সে বুঝলেন, যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে—

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে—এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝ রাস্তায় ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে থ্রম্বসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল—তাই বলছিলুম কোনো অসুবিধে ফিল করলে বলবেন—

পিঁ—পিঁ—প্যাঁ—প্যাঁ গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলিশবাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে ট্র্যাফিকের আলো। চলো হে বগলাপতির ব্যাটা পি. জি. ! মনে থাকে যেন সার্জেণ্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে—

—কোথায় যেন যাবেন স্যার !

—বললাম যে পি. জি. !

আই। ঠিক। পি জি.। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনো গৌরহরি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে ! প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভূত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সীটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝে মধ্যে অনেক রাতে নাইটশোর ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে

দেশলাই জেবলে খ‍ুঁজে দেখেছে। খ‍ুঁজেছে পিছনের সীটে, মেঝেয়। কোথাও কিছ‍ু নেই তব‍ু মাঝে মাঝে দ‍ুপ‍ুরে কি নিশ‍ুত রাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা ম‍ৃত লোক বসে আছে পিছনের সীটে ঘাড় লটকে—লট্‌পট্‌ করছে দ‍ুল‍ুনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ ব‍ুটে হাত পা বাঁধা 'ডেডবডি'। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘ‍ুরিয়ে দেখেছে পিছনের সীট। গাড়ি থামিয়ে খ‍ুঁজে এসেছে লাগেজ ব‍ুট।

তাই গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘ‍ুরিয়ে দেখছে গৌর। ব‍ুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। খ‍ুব ব‍ুড়ো নয় লোকটা—তব‍ু মরার কি কোনো বয়স আছে? মরলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে—পি. জি.-তে কী ব্যাপার স্যার! কার অস‍ুখ?

—আমার মেয়ে—ডেলিভারী কেস -

—বাঃ বাঃ। কী হল! নাতি না নাতনী।

—হয় নি। আজ কালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে—

—আজকালকার বাচ্চা তো! জন্মের আগে থেকেই জবালাতে শ‍ুর‍ু করে, শেষ জীবন তক্‌ জবালায়—

আসলে এসব কথার কোনো মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ ব‍ুড়ো মান‍ুষটা যদি হঠাৎ টেঁসে যায় স্ট্রোক-ফোক্‌ হয়ে—আর সে হয়তো টেরও পেল না, ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা—তাই কথায় কথায় সে ব‍ুড়ো মান‍ুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছ থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনো অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যে। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ঐ ম‍ৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন' হাজারে, কিনল বগল‍ুর পোলা গৌরা—

ডজটা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শ টাকায় সোফার রাখলেন! গৌর আপত্তি করল—হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার—

—শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ। আচ্ছা যা, একশ পঁচাত্তর পাবি, তার বেশী কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা।

গৌর একশ পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, ঘর-দোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত—এ রকম কাণ্ড জন্মে শুনি নি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে!

বাবা বগলাপতি বলত—তবুও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় হলে কী কাণ্ড যে হত!

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন—তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস্ রে! অ্যাঁ! বেশ তো হাত তোর! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ পাকা হয়ে গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সীটে বসে বাবা বিস্তর টাকা পয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছা গোছা নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার পোর্টমাণ্টেতে। খুশী হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসত। একটু টেরছা হাসিটি, চোখ দুটি মিট্‌মিট্ করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে

যেতেন! বলতেন—এ সবই তো তোদেই জন্য! বড়টা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেখে যেতে পারি—

গভর্নমেণ্ট কণ্টাক্টর বগলাপতি তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সিমেণ্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই! গভর্নমেণ্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যবসা জানতেন হাতের উল্টোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখদর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়ীজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তার। একবার ইচ্ছে করেই একটা মালের টেণ্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপনমনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপনমনে বলতেন—বুঝলি গৌর মালটা বছর খানেকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে; গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেণ্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে—পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায়! মাল কোথায়! লোকটা যখন প্রায় পাগল ঠিক সেই সময়ে বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন—আছে, মাল আছে। তবে লোকসানে তো দিতে পারি না। এই আমার রেট। লোকটা ডজ গাড়ির পিছনের সীটে বসে বগলাপতির পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেণ্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবো। বগলাপতি হাসেন—তবু তো জেল থেকে বাঁচবে! অবশেষে বগলাপতি রেট কমিয়েছিলেন লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সীটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা)—বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যবসা চলে?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি

নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা খুব ভাল চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দি কাশি, একটু ফ্যাস্ শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াতো, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু, বগলাপতি দূরে দাঁড়িয়ে ঘাড় এধারে ওধারে কাত করে পুরোনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ। প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করতো গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে-কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ গাড়িখানার যত চমক ঠমক ততটাই তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরোনো ডজখানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠছিল। সে যখন গাড়ি চালাত তখন মন প্রাণ দিয়ে। কোনোদিন তার হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায় নি। স্টিয়ারিঙে বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহরি না গাড়ি তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা —অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা— ।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেণ্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চালাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই-ব্লাডপ্রেসার। সহায় সম্বল বলতে হাফ-ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফাল্তু কিছুদিন বিলেতে থেকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফূর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাতো। সে নিজেও ফূর্তি লুটেছিল। তাই রেখে ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেণ্টের স্টোরিং এজেন্সী পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন। তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে—

ফাদার সিক, কাম শার্প ।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট শিখেছে কয়েকবছর। পাস করে নি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসলে জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং ছোটোখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভী ব্লু স্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যাণ্ড কি মোকাম্বোর পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প-কদিনেই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল রাখোহরির যোগা-যোগটা ছিল মিনিস্টার আর সেক্রেটারীদের লেভেল-এ। অল্প কয়েক-দিনেই সে এজেন্সীর ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল। তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ কারবার সেইসব ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত, রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমলে দেখা দিল উল্টে তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলীর। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত বাবা এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজকারবার.. এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারীর বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরে ফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোটো মানুষ সব, তোমাকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্যাণ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিঙে বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা সবাই হাঁ করে দেখছে সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং-এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল। অ্যাণ্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নাম রিপোর্টও যায়। কিন্তু না সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতারাতি উন্নতি দেখে তিনি

ভেঙে পড়েন, আর বলেন বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির করা দরকার। ইনস্পেক্টরকেও পান-তামাক দিতে হয়—আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে-আপদে এরা যে কত কাজে আসে—

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কণ্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারী। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ গাড়িটার বংশবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে উন্নতি ভাল বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বোর ভিতরে স্বপ্ন-আলোয় নাচে গায়, গ্র্যাণ্ড পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িখানা বারবার মুছছে আর মুছছে। ঐ তার আনন্দ, সুখ, সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যবসাপত্রের ব্যবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলাপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন—বড়গাছে নৌকা বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডোবায়—তুই কেন মরবি। তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই আমার ঘুম নেই।

পি. জি.-তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল লোকটাকে। লোকটা খুবই সাবধানী। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুল পকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে টায়ে তাই দিল, খুচরো ফেরতের কোনো ঝামেলা রাখল না। এক্‌জ্যাক্ট ফেয়ার বাহাঃ রে বাহাঃ।

—স্যার, ঐ সার্জেণ্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পেঁছে দিয়েছি

আপনাকে! দিই নি!

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে—সার্জেণ্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয় হয় আর কি! নম্বর টুকেছে তো আমি কী করবো? তোমাদের বদমাইশী কে না জানে? দেয় যদি ঠুকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও—গভর্নমেণ্টের পোষ্যপুত্তুর সব।

—বুড়োটা বক্‌বক্ করতে করতে কাটল।

শালা! গোরবাবুর টিফিন-টাইম হুড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ঐ সার্জেণ্ট না ধরলে গোরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী করতে বাবা বুড়ো-মাল!

বিড়বিড় করতে করতে গোরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে—এই যে, এই ট্যাক্সি!

আর না বাবা। আর না! এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গোরহরির নামই গোরহরি নয়। কারো সার্ভেণ্ট নাকি বগলাপতির ছেলে? অ্যাঁ! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সে তো বুঝতেই পারছি। মাসের প্রথম দিনটা তো—জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারো পয়সার কেনা চাকর নই। এই ল্যাণ্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ গাড়িটার মতো হ্যাঁ, আলবৎ, লাল কাপড়ের মিটার ঢাকার পর এখন এটা আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারী। গোরবাবুর টি-পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর-বদর। দরগায় সিন্নি, গির্জায় মোমবাতি—বাবা পুলুশে যেন আর না ধরে। পুলুশে ধরলে আঠারো ঘা।...অই দ্যাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে। কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখ। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল-পুলুশ। লাল নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু' একটা এসে ধীরে

ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি. জি. হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে—এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশী চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে—পালিও না—নম্বর টোকা আছে, সাবধান—

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে। নাঃ রসা রোড রসারোডের মতোই দেখাচ্ছে আবার। কেবল ঐ রঙীন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইন্ড স্ক্রীনটা, ঐ তো পুলিশটার কাঁধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রীন লাইট। চলো হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যান্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিঙ মেশানো চোতরা পাতার ক্বাথ না হলে আর এখন গৌরবাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বডি পড়ে যাবে।

গৌর ওড়ে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ' ইঞ্চ ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভাল লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাঁহাতক ভাল লাগে রোজ। মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভাল! গৌর খুশীতে শিস দেয়। তার গাড়ি উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে নেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সীটটা নজরে রাখে। শীলার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সবসময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং-এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনো হুজ্জতে গাড়িটার গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময়ে বসে আছে পিছনের সীটে। নয়তো লড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি তো নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই, না পরি। আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা গৌরা—। আমি শালা কার সার্ভেন্ট! লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ, আমি গৌরা—নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাবো। তুই

মরা মানুষ—মরা মানুষের মতো থাকবি—নো ইণ্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস্। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস—এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনো ভয় দেখিয়েছিস্—

ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপস্—। ফুটপাথে রঙ-বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা হাত ওঠায়। মোড়ে লাল বাতিতে দাঁড়িয়েছো কি—যেতে চাও বা না চাও -দরজা লক্ করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে—বড় দরকার দাদা, একটু কাইন্ড হয়ে নিয়ে যান—বাড়তি পয়সা দেবো—দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক্ করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যাবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলিশে তবে অন্য কথা। পুলিসকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন ডরাতো তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয় ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনোকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়াতে লাগল ইনস্পেক্টরদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত রাখোহরি। পুরোনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত—তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন—ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর মামাবাড়ি ধাত। আমার শ্বশুরবাড়িটার ঐ দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না—

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দূরের খুঁটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি-চামারী যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিওগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো

হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবারে উত্তর বাঙলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেণ্টদের খুব রমরমা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেণ্টদের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং-এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটা হিসাব ধরে শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইন-সঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যাণ্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরোনো ডজ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ-পোশাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরোনো ব্যবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং-এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যাণ্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথম দিককার মডেল, খুব চালু গাড়ি। বগলাপতি ন' হাজারে কিনলেন। গৌরকে ডেকে বললেন—বুঝলি গৌরা, তোকে যা দেব ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো। যদি ভাগ্যে থাকে রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুণে গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ঐ রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভাল, থাকবি আনন্দে, খেয়ে পরে। খুব বেশী লোভ-টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা-হলুদ রঙ করে, সীট-টীট পাল্টে, মেরামত করে, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল সিন্দুর ঠেকিয়ে, লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তায় বেরোলো। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন—ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছো। এতদিন ছিল ড্রাইভার তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যাক্সিওয়ালা!

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবে। ভাইদের হাতে তোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর-বাকর হয়ে যেত। বাপ মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন—তা দিলেই যদি তবে নতুন আর ভাল গাড়ি দিলে না একখানা। বিশ ত্রিশ হাজার টাকার দামী গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম।

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন—বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বৌ! দুর্দিনে একখানা দামী গাড়ি যদি গোরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো। তা নতুন ল্যাণ্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গোরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চালু, পচা মাল দিয়ে ওকে ঠকাই নি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইবলিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভাল। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিশও নয় নর্থের মতো টিকরমবাজ। গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মিটার খুললেই ট্যাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধারে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট—রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরের সেই কামানখানা এখনও লাল নীল হলুদ বল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস্‌ করে। ঠিক থাকো

গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দূরেই দাশ কেবিন। এই তো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু, আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল—

পিছনের সীটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনো ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ঐ শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবডিটাকে দেখা যায় না কখনো। কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারী শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাঁকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি। শালা ডাকটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা! কিন্তু ঐ একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাক্‌ল্‌ করা যায়, যতই জাঁহাবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্যি ল্যাণ্ডমাস্টারখানা বিনিপয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোরটুয়েণ্টি কোথাকার!

বিস্তর হাত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যাণ্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে—ট্যাক্সি—ই—ই—

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশে পাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে—আর একটু বাবা গৌর, আর একটু—শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা, যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ঐ ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনো সোয়ারী নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম—

ফাদার ফ্রান্সিস যখন খেলা শেখাত তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ-এর ঘেরা মাঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত—হে গৌরঅরি, ফ্যাস্‌ দি বল্‌।

গৌর চেঁচিয়ে বলত—পাস্‌ দি বল—

সে ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌—নট পাস—

গৌর হেসে কুটিপাটি—ফ্যাস্‌-ফ্যাস্‌—আই ওন্‌ট্‌ ফ্যাস্‌ দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস্‌—

—ডুণ্টু ছেলে গোরঅরি—অ্যাও, বালো ওবে না—

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেই সব রঙীন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন—এই গোরঅরি, ফ্যাস্ ইট্—ফ্যাস্ ইট—

—আই ফাদার—গোরহরি বিড়বিড় করে—আই উড লাইক টু ফ্যাস্ ইট ফাদার—আই উড ভেরী মাচ লাইক টু—

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তাঁর সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা।

উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে! গোরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গোর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার—গোরঅরি—অ্যাও গোরঅরি—গুড ফর নাথিং—

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং শব্দ করে। গোরহরি চমকে ওঠে! চমকায় পিছনের সীটের সেই ডেডবাড।

গোরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—যাবেন দাদা! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—

—দেখছেন তো মিটা। ঢাকা রয়েছে—

—একটু দয়া করুন—

দয়া! কিসের দয়া! কোন্ পুলুশটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে! কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট! কোন্ সোয়ারী কথা না শুনিয়ে ছাড়ে! অ্যাঁ! পুলুশ ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরো তখন! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি? এটা গোরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিন কি পোঁছনো যাবে শেষ পর্যন্ত? কে জানে! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গোরহরির। এখনো মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি। বাবা লালবাতি, গোর যে আর পারে না—বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল—। দাশ কেবিনের সেই চোতরা পাতার ঘন ক্বাথটি—যার নাম কিনা চা—সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে-নাড়া হয়ে যাচ্ছে—আমে দুধে মিশে

যাচেছ বাবা--

মচ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

—চোপ। বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা—বিনিপয়সার পার্মানেণ্ট সোয়ারী! হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেণ্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রীন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোলো গৌর, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতরে এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা শুখো আর একটা ভাল পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনোদিনই কারও সার্ভেণ্ট নয়। ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যাণ্ডমাস্টার—মিটারে লাল কাপড় জড়ানো প্রাইভেট। গৌর যখন খুশী খুলবে কাপড়, যখন খুশী প্রাইভেটকে ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোন শালার কিছু বলার নেই। এখন দাশ কেবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিস্‌গিস্‌ করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল-ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশী শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা—কোনো শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর-সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সীটা যখন ফুলে ফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী—রাখহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয় নি। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পাল্টে গেছে মিনিষ্টার। নতুন করে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে রুই-কাৎলা ধরো। যাদের চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে রাখোহরি, তখন

তাদের জো। তারা ওঁত পেতেই ছিল। কোনো গুদামেই মাপ মতো মাল থাকে না। একথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান-তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান-তামাকের বন্দোবস্ত তখনো করে উঠতে পারেনি রাখোহরি। উত্তর বাংলার গর্দিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইনস্পেক্টর আর দারোগা তার দুটো গুদাম দিল সীল করে। রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মাথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারী রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারেন নি। একা একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে রাখোহরি। অবশেষে বেগতিক দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে—বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইনস্পেক্টর নয়, অন্য ব্যবসায়ীরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসী। বিলেতে ম্যানেজমেণ্ট শেখা রাখোহরির মুলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবু বগলাপতি শেষ চেষ্টা করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নালী ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে। তখন পাবলিক গেছে ক্ষেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের দুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালো-বাজার! দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রু! তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকতে সীল করা গুদামে লোক লাগিয়ে রাতারাতি টিন ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি - দুজনকেই পুলিসে ধরল। বালীগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ-ফিনিশ গোরা।

গোরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গোরা সকালে ল্যাণ্ডমাস্টার নিয়ে বেরোয়। সারাদিন কলকাতায় সোয়ারী এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে এসে মায়ের কোঁচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়—ও আমার গোরা। শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, এ কথা কে ভেবেছিল, বাপ আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক টিক করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি।

ধীরে সুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে—আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাবো।

—গঙ্গার ঘাট! মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালই লাগবে গৌরের।

—চলুন বলে সে লক খুলে দেয়।

ছেলেমেয়েদুটো কলকল করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথার মাঝখানে মাঝখানে একটু আধটু ফিস্‌ফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে—লোকটার একটা হাত দেখেছো। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে—একটা পাও তাই।

—ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাক্সিডেণ্ট করবে না তো!

—দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা; বগলুর পোলা গৌরা—হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেণ্ট—ছা-রা-রা-রা-রা—

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তার চেহারা রোঁয়া ওঠা কাকের বাচচার মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া দুল্ দুল্ করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ গাড়িটা ছ'হাজারে বিক্রি করেছে রাখোহরি। কেস, চলতে লাগল। সে কী চলা। তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। কেস চলে তো চলেই। সেই কেসই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দুটো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হুড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দু'মাস পর মা। তখন বিলেত-ফেরত ম্যানেজমেণ্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কাণ্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝে মধ্যে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত—হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু' হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও ছোঁয়াল না গৌরকে। দূরদশী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যান্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কোনোদিনই। করলেই মল-পরা দুটি পা মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ মুখ ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগীর নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝম্ ঝম্ মাথা থেকে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড় মজ্জা সব সেই ঝম্‌ঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনীর বাড়িতে উঠে গিয়ে বালীগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুঁল না কমদামের ল্যান্ডমাস্টারটা তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে গৌরহরির আয় থেকে সে নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এইসব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল, এই সব গৌরহরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশী বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ঐ নাচুনে মাগীর বেহন্দ নাচ। তাই চিন্তাভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে—আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল—এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম ? এই যে রুখো-শুখো দুটো হাত-পা, মগজে এই যে এত ঝম্‌ঝম্ এইসব নিয়ে আমি কত দূর কী করছি দুনিয়ায় ? কী করার ছিল আমার ! আর কী-ই বা করেছি ? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরোনো ল্যান্ডমাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া ! এই করতে করতেই কি শালা কোনো মানুষ পারফেকশানে পৌঁছাতে পারে ! অ্যাঁ ? বগলুর পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেকশান লেখা ছিল ? বিলেত না,

বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বৌ না, না ছেলেপুলে—কেবল একটা ভুতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার ক্বাথ—আর শালা পুলিশবাবা, লাল নীল আলো—ঝুটঝামেলা—গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি—টেরিটি বাজার থেকে সাউথ সিঁথি—আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার ?

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গী। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়েমানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারী আছে। সোয়ারী জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূর থেকে—তার গাড়ির পিছনের কাছে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘণ্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ চাল্লিশ টাকা আয় হয় তাং। আর সেই সঙ্গে কখনো সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু ছোঁয়া যায়। সেটুকু ভাল লাগে না গৌরের। কেবল বদরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিমঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটুকু পাচ্ছে, একটুকু পারফেকশান। তার বাপের কিনে দেওয়া ল্যাণ্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে গৌরহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালই রাখোহরির। একের পর এক কেস জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন গলিঘুঁজির পথে—কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালীগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাবড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যবসা। রিফিউজি কলোনীর বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই এখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই।

কোনো সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয় সম্পত্তি ঝেকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ। বাপের দেওয়া ল্যাণ্ডমাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনীর দুখানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলায় খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়—শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস্! আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াবো।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সীটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাঁচে তাদের ছায়াদুটোকে দেখা যায় লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী। গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপটা মারে। নিওনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়েছে। ঐ দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে—এই তো বিদেশ! এই তো শালার লণ্ডন, যেখানে একদা ল্যাণ্ড করেছিল তার দুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হতো মেম বৌ। বেগড়বাঁই বাঁধালো মগজের ঐ ঝম্‌ঝম্ শব্দ, আর, দুটো রুখো-শুখো হাত-পা।

ভাবতে ভাবতে শ্বাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুস্‌ফুস্ পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লণ্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

—ওমা! এসে গেছি! মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়াদুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখ্‌খা পার্টি! ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই

ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যাণ্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিছানা, না হানিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না জিজ্ঞেস করল—কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল—চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রুক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে ছেলেমেয়ে থাকলে ডাঁটিয়াল ছেলেরা মিটার-ফিটার দেখার ঝামেলা করে না। গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে। সেও আন্দাজী মারে। বগলুর পোলা গৌরা—প্রেস্টিজে সে কম যায় কিসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যাণ্ডমাস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে। মিটারটা আবার লাল শালুতে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাপ করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রীটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলদে একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধু-ধু করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর সুনসান ডেক। কোনোখানে কোন মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনো দেখে নি গৌর। সে হাঁ করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন্ কোন্ মুলুকে চলে যাও হে জাহাজবাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন্ গাড্ডায়! ফিফটি পারসেণ্ট বলে গৌরার সব ফুর্তি'ই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার ঐ ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার লাইফ্‌টায় কী আছে বলো তো! ঐ ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টার, দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর ঝমাঝম্। কলকাতার সওয়ারী এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে জীবন! বাবা জাহাজ সাত ঘাটের জল খাও তুমি।

সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা !

মার শালা ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতার সওয়ারীদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফটি পারসেণ্ট, হাফ-ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যাণ্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেকে বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশী বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না, জাহাজ-খানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই। জাহাজখানা হাফ-ফিনিশ গৌরকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে—বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলাম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরবো লণ্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দুরকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থেকো, হে বগলাপতির ব্যাটা বগলুর ছাওয়াল, সংসারে চালু থাকাটাই সাক্সেস।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশের বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরেই সংসার চালু থাকবে। বগলুর ফোরসাইট ছিল বটে। আজো যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ঐ ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরেই। ঐ যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ঐ ভূতুড়ে—ল্যাণ্ডমাস্টার—মগন সিং-এর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন' হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোঁয় নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যাণ্ডমাস্টারটার জোরে, তবু, কখনো-সখনো গঙ্গার ঘাটে এলে নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সওয়ারীদের আর তিন লাথি নিজের কপালটায় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলুও বলত এরকম কথা তোমার মতো সংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দূরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বঁড়শি বিঁধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায়। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকার টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা—হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেণ্ট গোরা—খুব বেশীদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে-ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ, আমি যখন মুরগীহাটার সওয়ারী বাগবাজারে খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছো টোকিও, কিংবা ফিরতি পথে লণ্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখ তুমি, দেখ সমুদ্রের ঝড়। ইটালীর জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মাস্তুলে। বাবা জাহাজ বুকের বঁড়শিটা মাঝে মাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যাণ্ডমাস্টার। হাফ-ফিনিশ বলে গোরা যে কোনো কিছুই পায় নি জাহাজবাবা।

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আই। বগলুর দুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল, দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশে, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভূতুড়ে ল্যাণ্ড-মাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যাণ্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর, বনেট বন্ধ করে। ড্রাইভিং সীটে বসে চাবিটা বের করে, তারপর হঠাৎ আগা-পাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনের সীটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা?

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যাণ্ডমাস্টারটা কোনোদিনই সেণ্ট পারসেণ্ট

গৌরহরির না। ওর ফিফটি পারসেণ্ট ঐ শালা ডেডবডিটার—এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে গৌরহরি বুঝতে পারে—শালা ভূতেরাও দাবি-দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে-হেজে গেছিস—তবু একটা পুরোনো ল্যাণ্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগলু সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা—দ্যাখ—এই হাফ-ফিনিশ আমার জীবনটা—টিকাটুলির ডাকসাঁইটে বগলাপতির ছাওয়াল আমি—তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ঐ ল্যাণ্ডমাস্টারটা—যার ফিফটি পারসেণ্ট ভূতের কবজায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনো ইণ্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার ল্যাণ্ডমাস্টারে? ল্যাণ্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দূরে দাঁড়িয়ে তার ল্যাণ্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে—হেই। কাম হিয়া—

অমনি গৌরের মাথায় ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের পাক্কা ইংরিজিতে বলে—এখানে কি হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও—

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলানো। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে নেড়ে গৌরের ধমক-ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে—টেক মি টু স্যু।

—স্যু ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো—

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি? চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে—মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি। তুমি কেটে পড়ো—

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ্য করে, লোকটা বেঁটে-খাটো, বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপীতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রঙ রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন্ দিশি। তবে জাহাজী বলেই মনে হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনো কোনো স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের ক্বাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। ধোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

—নামবে কি না বাপু, না কি পুলিস ডাকবো? গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি ভড়কে যায়। নামবে কিনা ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাব ভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজীর পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে। বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত, তিন নম্বর যদিও হাফ-ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজী।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে—আমাকে স্যুর কাছে যেতেই হবে। আমাকে পেঁছে দাও—দয়া করো—বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে—আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই! একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি, আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখ কত টাকা—

টাকা দেখাচ্ছে! টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি—যে কিনা ডজ গাড়িটার আয়না দিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে—তাকে কিনা টাকা দেখাচ্ছে ফুটো পকেটের জাহাজী! ভারী রেগে যায় সে। ভাল হাতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজীটার হাত ধরে টান মারে, চেঁচিয়ে বলে—নামো, নামো—টাকা আমি বিস্তর দেখেছি—

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভেতরে সেঁধোতে থাকে। পা দুখানা সীটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে, বলে—দয়া করো—

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরী। আর লোকটা সেণ্ট পারসেণ্ট হাত-পা-ওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সীট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে—ফোট্ শালা বেজম্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই—

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজীটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে—আরে বাঃ, তুমি বাঙালী দেখছি।

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল—তুমি সাহেব নও ?

লোকটা সীট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে—আরে দূর। আমি তোমাকে সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি, শিখলে কোত্থেকে অমন ইংরিজি ?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—সেণ্ট অ্যাণ্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোত্থেকে শিখেছো ?

লোকটা—যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমনভাবে—সহজ ভঙ্গীতে উঠে বসে, হাত-টাত ঝেড়ে বলে—আমি শিখেছি জাহাজে, সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালীর মুখে ভাল ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে—আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না—

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে তাকায়, বলে—আমি শুধু একটু বীয়ার খেয়েছি। মুখ শুঁকে দেখ। হাই—

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলে—তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালী দাঁত চিকমিক করে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে—আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাগ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না! গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে—

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড একটা দেখে নি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলিশবাবা ধরে, কোন সওয়ারী কোন গাড্ডায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যাণ্ডমাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়ে কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে—তোমার মতলবখানা কী?

লোকটা মিনতি করে—আমাকে নামিয়ে দিও না, স্যর—কাছে পেঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে—সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয় নি—

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়—এই নাও সিগারেট—

গৌর মাথা নাড়ে—না।

লোকটা মিনতি করে—নাও মেট। খুব ভাল সিগারেট। পুরো প্যাকেটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌরা মাথা নাড়ে—না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে—আমার জাহাজের জাহাজীরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজীটা সারা সন্ধ্যেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি—

জাহাজীটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে সুরু করে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড় বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুর্বল বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজী হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন কেঁবলে যায়। মায়েদের মতো 'ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে—সন্ত কে ?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁত দেখায়। সোনালী দাঁতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামী গ্যাস লাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে—বোসো—

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যান্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সীটে বসে দরজাটা খোলা রেখে, গঙ্গার হুড় বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে—দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজীরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয়-স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, কত হাগিং কিসিং, কত আদর ভালবাসার কথা হয়—না ? বুঝলে, আমারও ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চা বেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না, কলকাতা মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রঙ পাল্টে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদর হত আমার কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুঁয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল. মা মরল। দুবার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল। ছোটো ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম ! কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখিনি —জাহাজের খালাসী! আমাকে ব্যাটা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি-বাড় সে ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তার বৌ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল—জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিঁড়ে যায়। তখন কলকাতা-মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লণ্ডন বা টোকিওয়

যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—আরে, আমার যে কোনো পিছুটান নেই! আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না! অন্য জাহাজীরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল—বুঝলে! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশী চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হত, ঐ শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয় নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে—কেমন শব্দ বললে?

—ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মত।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে—আমার হত ঝম্‌ঝম। অনেকটা নুপুরের মতো।

—আই। লোকটা বলে···তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাঁইঝাঁই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজী পরামর্শ দিল—বিয়ে কর। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম—সানফ্রান্সিসকোতে। আমার বৌ বেশ সুন্দরীই ছিল—খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা পয়সা যোগ করে আমরা তিন-চার মাসের হনিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা জায়গায়। সে কি ফুর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হনিমুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল—লম্বা টুর। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক'মাস বৌয়ে চিঠি পাই নি। জাহাজ আমেরিকা-মুখো হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল—এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম বৌ জাহাজঘাটায় আসেনি। খানিক দূরে এক ছোট টিলার নিচে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল—খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউইয়র্ক চলে গেছে। বুঝলাম, বৌ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায়না। মেমসাহেবরা বেশীদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে

পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি, বীয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড্ডায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালবেসে ফেলল। বুঝলে, মেম-সাহেবরা চট করে ভালবেসে ফেলে। আমারও বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তাই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বৌ গরীব, অরফ্যান। ভাবলাম, গরীবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছা-কাছি। মাস দুই হনিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বৌ টিকল। কয়েকবার টুর করে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি দেশে ফেরার আনন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমি-জিরেত কিনে বসবাস করব! পোলট্রি, ফার্মিং করব। তা সেবার লম্বা টুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ টুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে ন্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার টুর-এ বছর দেড়েক লেগে গেল। বৌ মাঝে-মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জানিয়ে টাকা পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেড় দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন! ঠিক আগেকার মতো ঘরগেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না। বৌ কেমন চোর-চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঁঝ দিচ্ছে! বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ-মুখ সে মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বৌটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজীদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বৌয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়েত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে—তা কত টাকা-পয়সা আর সোনাদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দুজনে—এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই।

মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনো কোনো মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামীর বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে তিন চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ-টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনো পুরুষ সে কদিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে লোকে, সেরকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল, দুই বৌয়ের জন্য দুরকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দুধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝাঁইঝাঁই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই একমাত্র জাহাজী—যার ফেরা নেই, কেবলমাত্র যাওয়া আছে। জাহাজ ভোঁ দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে গুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে-কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো 'মা' বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল, মা তো নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাবো? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শূন্য জাহাজ, সব জাহাজী গেছে ফুর্তি লুটতে। আমি একা একা ভুতুড়ে জাহাজটার আনাচে-কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাঁদি। কাঁদি মরা মা বাপের জন্য, দুই বৌ আর-না-হওয়া বাচ্চা-কাচ্চার জন্য, কাঁদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজী আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস্ বার-এ। সন্‌-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাঙলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালী মেয়ের মতো। ভারী ভাল লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারী আমুদে মেয়ে, বলল—তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল

আকাশে। রাত তখন অনেক। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় আমাকে সন্ন্যু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে এসে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারিদিক সুনসান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দুজনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধ—ও রকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখি নি। সামান্য মদ ছিল দুজনেরই পেটে, ঝুমঝুমে মাতাল ছিলাম দুজনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ সন্ন্যু লাফিয়ে উঠে বলল···দেখ দেখ, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে। আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে মুখ তুলে বলে—ইস্‌ দেখ, কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে—আঠার মতো ঘন···কী মিষ্টি··কী স্বাদ···। দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা সেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি—কী স্বাদ—কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজী ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টুপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দুজনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়ি নি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন-চারদিন ছিলাম সন্ন্যুর কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধ্যেবেলা দুজনে হাল্কা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া—আহা—

জাহাজীটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গোরের আঙুলে ছ্যাঁকা দিচ্ছে ছোটো হয়ে। জাহাজীটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গোরের দিকে চায়, বলে—এসব আড়াই তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার

কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝেছি, সুয়ু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র সুয়ু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ সুয়ুর দেখা পায়। তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজীটা রথম্যানের প্যাকেটটা গোরের ডান হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে—বার ওয়েসিস্—সুয়ু—তাড়াতাড়ি পেঁাছে দাও—

গোর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনো হজম হয় নি।

জাহাজীটা মিনতি করে—দশটার পর সুয়ু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার সুয়ুর সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর একবার সেই জ্যোৎস্না খাবো। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিনবছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুর গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজীরা পাছে সুয়ুর কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে—এমনই কপাল—সব জাহাজী গাড়ি পেল—বাদে আমি। দু'ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছি, একটাও থামে নি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি—আমাকে ফেলে যেও না—সেই জ্যোৎস্না সুয়ু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান—জ্যোৎস্না——সেইসব ফুল—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে - কী নেশা তার—বয়স কমে যায়—চোখের জ্যোতি বাড়ে—শরীর ফুঁসে ওঠে—আর একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাবো না—মেট, তাড়াতাড়ি করো, সুয়ুকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়—

—ঠিক হয় তবে। গোর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে গেট। বিড়বিড় করে বলে—দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গোরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চল্ বাবা ল্যাণ্ডু, জাহাজীটাকে খালাস দিই—

গোর গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সীটে ঝিম্ মেরে থাকে জাহাজীটা।

আয় বাবা ধরমতলা—বার ওয়েসিস্—জাহাজীটাকে ডেলিভারী দিই গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে—মাইরি—জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে, জাহাজীটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝিম্ মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনো। জাহাজীটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে, পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজীটা নামে, একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে—কীপ ইট মেট। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে—এই, চেঞ্জটা নিয়ে যাও—

জাহাজীটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের। বখশিশ-টখশিশ সে কখনো নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশী পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার বাপ বগলু তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে।

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত পয়সা গুনেগেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজীটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ধীরে সুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে—শুঁড়িখানায় যেমন হয়—তেমনি নরম আলো-টালো, চেয়ার—টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর মাতাল। লম্বা কাউণ্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক, নানা রঙের বোতল চিকমিক করে। সেই কাউণ্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন-চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজীটাকে নিম্-আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরো দু-এক পা এগোয় গৌর। দু-একজন মুখ তুলে তার নেংচে-হাঁটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝপথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজীটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে—এই—

জাহাজীটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দু'কাঁধ দু'হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও—বলে—গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউণ্টারের দিকে এগোতে থাকে।

—কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও—

জাহাজীটা কেবল চাপা গলায় বলে—কাম্ অন্। সুকে এইখানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কাম্ অন্।

কাউণ্টারের স্যুট-পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজীটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজী ইংরিজিতে বলে—সু—শ্যামলা পাতলা চেহারা মিষ্টি মুখ—চোখের পাতা ভারী ভারী—খুব ফুর্তিবাজ—তিনবছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম—খোঁজ দিতে পারো?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে—না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিনবছর লম্বা সময়—কত কী হয়ে যায়!

বলে লোকটা হাসে।

কাউণ্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজীটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল—আমরা সবাই সু, কেউ কু নই গো।

বলে হেসে অন্য একটি মেয়ের কাঁধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজীটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে, তারপর হতাশ গলায় বলে—না, তোমরা নও। সু অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

—শোন লতিকা—বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাঁধে হেসে গড়াল। দুজনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বগলুর পোলা গৌরা।—এ কোন গাড্ডায় এসে পড়েছে! জাহাজীটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ-হাতখানা। কমজোরী হাতটা তার ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই, চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজীটা ঠোঁট চেটে বলে—বড় তেষ্টা। চলো একটু

বীয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে– আমি না, চেঞ্জটা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও—

সে সব কথায় কানই দেয় না জাহাজী। বলে—তেমন কিছু না। একটু বীয়ার—এসো—

ওর শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজী, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে – তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না মেট। কলকাতায় এক সন্ত ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভাল লোক—

দুটো বাহারী কাচের জগ-এ বীয়ার আসে। আসে সেঁকা পাঁপর, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনো তার ডান হাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা, বাঁ হাতখানা জাহাজীর কবজায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনো কাটে নি। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। সে একটু ভাববার চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে! চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর, অমনি তার মাথার মধ্যে একখানা মল-পরা পা ঝম্‌ করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা-চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনো খায় নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করে নি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিঁকে থাকে, আর থাকে তার ল্যাণ্ডমাস্টারখানা—তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মলপরা পা আর একবার ঝম্‌ করার জন্য ধীরে ধীরে উঠেছে, টের পেল গৌর। এমনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠাণ্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজীটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে— বড্ড তেষ্টা বেয়ারা—

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

—আরো।

বেয়ারা জগ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটুক্ষণ। তারপরই ঝুপ করে মুখোমুখী চেয়ারে বসে পড়ে দুজন। কাউণ্টারে দাঁড়ানো সেই দুজনই।

—একটু খাওয়াও না গো! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! যে মেয়েটা হেসেছিল সে বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে-ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা কালো, পুরু ঠোঁট, বেশী বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুল বারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ঐভাবেই ফেলে রেখে বলে—নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উল্টে বাড়িয়ে ধরে—দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা—কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যাণ্ডমাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফুর্তি লোটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বীয়ারের ঝাঁঝটা তার পেট থেকে মগজে রিন্‌রিন্‌ করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিন্‌রিন্‌ শব্দটা বহুদূরে গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে—এঁটো খাবে?

—এঁটো আবার কী গো! প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—মুখের এঁটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

—আমাদের সবকিছু এঁটো—

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গীও ভাল না। গৌরের বড় ঘেন্না

করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকী অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে—এবার ফোট। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজীটা জগ-এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে—আরো খাবে? খাও। বেয়ারা—

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

—এবার বলো। জাহাজীটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে

—কী? মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

—সন্যর কথা।

মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।

—কেমন ছিল তোমার সন্য? রোগাজন জিজ্ঞেস করে।

—লম্বা। সোনালী চুল। নীল চোখ। খুব ফর্সা।

যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজীটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—এই, তুমি যে একটু আগে বললে শ্যামলা রঙ, চোখের পাতা ভারী ভারী—

লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজীটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে বলে—বলেছি?

—নিশ্চয়ই। গৌর ডান হাতে টেবিলে চাপড় মারে।

জাহাজীটা শ্বাস ছেড়ে বলে—তবে তাই।

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজীটা প্রশ্ন করে—চেনো?

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে—না।

—সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাঁতগুলো বের করে গরগরে হাসে—জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ—কত কী খাওয়াই আমরা—

জাহাজীটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে—পৃথিবীর সাতঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ঐ কথা বলেছে। কেউ পারে নি। তিনবছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজী।

—চলো মেট—সময় নেই—

তারপর মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে বলল—তোমরা থাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না—তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।

জাহাজীটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

গৌর চারদিকে একটা রিম্‌ঝিম্‌ আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমা হল-এর আলোগুলো আরো রঙীন মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজীটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরানো বন্ধু—মাঝখানে কেবল একশ বছর দেখা হয় নি।

দুজন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে ল্যান্ডমাস্টারের কাছে আসে।

—এবার কোথায় ?

জাহাজীটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে—স্যু যেখানে। খুঁজে বের করতে হবে—কাছাকাছি কোনো বার-এ সে আছে—

গৌরের এখনো যাকে নেশা বলে তা হয়নি ঠিক। গাড়িটা সে দিব্যি চালায়। জাহাজী তার বাঁ পাশে মাঝখানে সীটের ওপর রথম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আছে—সবই বুঝতে পারছে গৌর। না, নেশা হয় নি। গাড়িটা মাখনের মতো যাচ্ছে।

—ব্যস্‌ মেট—একবার এ জায়গাটা—

জাহাজী হাত বাড়িয়ে গৌরের হাত চেপে ধরে।

গৌর গাড়ি থামায়। বাঁ পাশে আর একটা বার। খুব বড় নয়, কিন্তু জায়গাটার বেশ ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যায় মানুষেরা।

জাহাজী হাত ছাড়ে না।

—নামো।

গৌর হাই তুলে বলে—আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো—

—না—আমি একা খুঁজে পাবো না—শহরটা বড়ো অচেনা লাগছে—নামো মেট—

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তি'বাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম শীতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোকজন, কাউণ্টারে বেয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের মাউথপীস মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম্। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদ সংগীত। তবু ফুর্তি'র জোয়ার বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগুস্! আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মনের গেলাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউণ্টারের ওপাশে সাহেবী চেহারার দুজন লোক ভারী ব্যস্ত। টাকা-পয়সা গুণে নিচ্ছে। জাহাজীটা কাচের ওপর টোকা দিতে দুজন মুখ তোলে।

—সুন্যি নামে একটি মেয়ে—গায়ের রঙ শ্যামলা—বাদামী চুল—নীল চোখ—

মাতাল। গোঁর হাসে। বলে—অ্যাই—গায়ের রঙ শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যাঁ!

—হয় না? ভারী অবাক হয় জাহাজী। বলে—তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গোঁর একটু ভাববার চেস্টা করে। মাথা ঝিমঝিম্ করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে—কালো।

—তো তাই।

জাহাজীটা আবার লোক দুটোর দিকে ঝুঁকে বলে—তার চোখ আর চুল কালো—খবর দিতে পারো?

লোক দুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে! একজন নরম গলায় বলে—দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

—আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

—অফ কোর্স'। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে—ড্রিংক্স্?

—হুইস্কি। বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজী।

—এই—ডাক দেয় গোঁর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজী। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদ সংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে —এখানে সন্ নেই। এসব তার জায়গা নয়! আরো নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। টাবু তার বিষাদ-সংগীতে করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানীর মতো মৃদু, অশ্রুরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজীও।

—আমি জানি সন্ এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম। জাহাজীটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনো মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে। না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

—চলো মেট—

গেলাস শেষ করে গৌর ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাঁকা লাগে। তবু বলে—চলো—

—কোথাও না কোথাও আছেই। জাহাজী আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজীর মেয়েছেলে সন্? গৌর ঠিক বের করবে।

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর—বগলুর ছাওয়াল—যার হাতে গাড়ি কোনোদিন ঘষাটাও খায় নি—ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গীর বড় রাস্তায়।

—ঐ যে দেখছ উঁচু মিনার—ঐ যে—

এই বলে জাহাজী গৌরকে কনুয়ে ঠেলা দিয়ে অদূরের মনুমেন্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে—ঐ মিনারটা আমি

আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভাল হয় নি ?

মনুমেণ্টটাকে আবার ভাল করে দেখে গৌর। দেখে-টেখে মাথা নেড়ে বলে—ভাল। দিব্যি উঁচু।

—আই। জাহাজী শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

পার্ক স্ট্রীটকে কখনো কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বীয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরো মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লণ্ডনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজী বলে—লণ্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি। গেট-এর কাছে দু'জন সাহেবী পোশাক পরে দাঁড়ানো। তাঁরা সিঁড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুর দরজা সে আর দেখে নি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে, জাহাজীটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

—কম অন্—সময় নেই—এখনো আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না—

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল—সুন্দর সিলিং—তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ—কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মত নয়! কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম! এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনো ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজী তাকে টেনে তুলল।

—সময় নেই মেট—

—ওঃ হ্যাঁ। ঠিক। গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা, তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। অর দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত

—গৌরই পুরোনো ডজ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যুট আর বুট পরা বিলেত ফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনায়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ-ফিনিশ গোরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে—একটু নেংচে হাফ-ফিনিশ গোরা—বগলুর ছাওয়াল—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর—আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে! কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ! এরকম আর দেখে নি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা নেই—কেবল আলো আর রঙ, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ - একটু স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে—যেন বা বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা! বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কিনা! হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজী তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া নিজেকে বাঁচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে—উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়—আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের শব্দের মত ঢিপঢিপ করে বাজে।

জাহাজীটা চমকে উঠে দাঁড়ায়।

—চলো—মেট—শীগগীর—

—কোথায়?

ঐখানে—ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে—একটা মেয়ে—স্যু হতে পারে—

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙীন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা।

তারা দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

— টিকিট ?

জাহাজী হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামী শরীরের চামড়া যেন তেল মাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়াল নরম মাংসের ঢেউ কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানী পুঁতির কাঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে—আবার আলোয়। পৃথিবীর পুরুষকে ডাক দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ডু লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে—আবার আলোয় —আবার অন্ধকারে—তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। শ্বাস পড়ে, শ্বাস ওঠে— কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ—লোলা-লোলা-লোলা—

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখে নি।

অন্ধকারেই জাহাজী তার হাত চেপে ধরে—মেট, এ নয়—

—নয় ?

—নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলো তার ঘাগরা ছেড়েছে, কাঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো—এসো—এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা—

তবু সে সুন্য নয়। হতাশ জাহাজীকে সে খাওয়ায়নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল

সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে আর তখন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার পার্কস্ট্রীট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে সন্তু-র খোঁজে।

আই। গৌর টের পায়, গাড়িটা উড়ছে। উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে পার্কস্ট্রীটের আলোর ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্র্যাফিকবাতি দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখবার দরকারই বা কী গাড়িটা উড়ছে যখন!

—মেট। জাহাজী মৃদুস্বরে বলে।

—উম্।

—নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে ঝুঁকে রাস্তাটা দেখে। ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল। ভিখিরি! মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ঐ আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ঐ আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস। তাঁকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনরাত শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশি হয়। গাড়িটা আর একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভাল লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে—দেখ, কত উঁচুতে উঠেছি।

জাহাজীটা গলা বাড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে বলে—আর একটু ওপরে ওঠো মেট। সন্তু বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় ধুলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিস নেই। কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজীটা এলিয়ে পড়েছে সীটে বিড়বিড় করে বকছে—বাড়ি বাড়ি খুঁজবে। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরবো। প্রতিটি শুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় সন্তু?

গৌর রাস্তাটা ভাল দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে। সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরী নামছে।

শিশু-পরী সব। ন্যাংটো, ফর্সা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো ঝুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনিই সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

—কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়।

বলে হেঁচকি তোলে জাহাজী।

—গাড়িটা জোরে চালাও মেট! নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

—পাগলা! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

—কাদের? জাহাজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—ঐ যে, পরীরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরী, ভাল উড়তে শেখে নি এখনো জাহাজী ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরী দেখার চেষ্টা করে।

—কোথায় পরী?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

ঐ তো সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ঐ দেখ একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল—ঐ আবার উড়ে গেল! নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুঁড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

—কিন্তু পরীরা আছে ঠিক। সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের এরকম পরীদের ছবি ঘরে ঘরে ঝোলানো থাকত। সোনালী ডানা, লাল ঠোঁট, নীল চোখ…

জাহাজী বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে—নীল চোখ! নীল চোখ! স্যান্ড্রার ছিল ঐ নীল চোখ! ঠিক নীল নয়, একটু বাদামী। কিন্তু ওর গায়ের রঙ ছিল বড্ড কালো। যখন ঘরের আলো

নিভিয়ে দিত—বুঝলে—যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন কিছুতেই ওকে খুঁজে পেতাম না। ওর ঐ কালো রঙের জন্যই। স্যুর বুকভরা ছিল এক শ মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোতো, আর আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে কখনো দেয়ালে, কখনো ওয়ার্ডরোবে, কখনো খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোতো খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোষাকের নিচে। একশ মজা ছিল ওর। বড্ড কালো ছিল বলে—

—কালো! গৌর ভারী অবাক হয়—কালো কোথায়? তুমি যে বললে, ফর্সা আর নীল চোখ।

—বলেছি?

—আলবাৎ!

—তবে তাই। জাহাজীটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—তবে তাই।

কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে—দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফর্সাই কী? সব সমান।

—না না। ঘরটা একদম অন্ধকার হত না কখনো। বাইরে জানালার সোজাসুজি একটা নিওন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা। আঃ হাঃ কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—কী যেন—

লিপটন? লুফ্‌টাহানসা? গুডইয়ার? ক্যাপস্টান?

নাঃ ওসব নয়। কলকাতার শুঁড়িরা—জাহাজী হেঁচকি তোলে।

—যেতে দাও। গৌর বলে।

জাহাজীটা মাথা নাড়ে—না না। যেতে দেবো কেন? সেই নিওন সাইনটা ছিল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজী মুখে আঙুল পুরে ভাবে! শিস্ দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরীরা আরো নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরী নেমে আসছে। দু-তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছে। কাচ তোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানলার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো। আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেবো।

ইয়াঃ। সেই নিওন সাইনে লেখা ছিল—ইউ ওয়ান্ট লায়লাজ ব্রেড। চাও তুমি লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বলত 'তুমি', তারপর

'চাও', তারপর 'লায়লার সবশেষে 'রুটি', চারটে শব্দ। 'তুমি', জ্বললে ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত—সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও', সেটা জ্বললে আরো একটু সবুজ আলো আসত। তারপর 'লায়লার' থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত, মাঠঘাট, সবুজ ঘাস—এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত—'তুমি', তারপর 'চাও', তারপর জাহাজীটা হেঁচকি তোলে।

পিছনের জানালা গলে তিনটে পরী ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুঁটো সাদা। মোটা মোটা থোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালী ডানাগুলো পাতলা ফিন্‌ফিনে—যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

—ই-ফ! জাহাজী আবার হেঁচকি তোলে।

—চোপ! ধমক মারে গৌর—হেঁচকি তুলো না। পরীরা ভয় পাবে।

জাহাজী অবাক হয়ে বলে—কারা বললে?

—পরীরা।

—কোথায়?

—পিছনের সীটে বসে আছে তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে—কোথায় কী?

—আছে। তাকিও না।

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—আসলে কলকাতার শুঁড়িরা—

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজী। গৌর গাড়িখানা ফাঁকা রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডের তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে। গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরীদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজীটা বলে—আমরা জানালায় বসে সেই নিওন সাইন দেখলাম।

—কোন নিওন সাইন?

—সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিওন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাতো। আমি সন্যুকে জিজ্ঞেস করতাম—সন্যু, লায়লা কে? সন্যুও আমাকে জিজ্ঞেস করত—লায়লা কে?

আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিওন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত—তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লার রুটি। আমি সন্তুকে জিজ্ঞেস করতাম—সন্তু, তুমি লায়লার রুটি চাও? সে বলত চাই। ফের সে আমাকেও ঐ কথা জিজ্ঞেস করত, আমিও চাই কিনা, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না!

—পাওয়া যায় না?

—না।

—সে কী? তাহলে নিওন সাইনটা ছিল কী করতে?

জাহাজীটা একটু ভেবে বলে—অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনো লায়লার রুটির খোঁজ করি নি! দিনের বেলা মনেই থাকত না! রাত্রি বেশী হলে যখন নিওন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজতে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনো মাঝে মাঝে-রাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিওন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে তুমি চাও··· তুমি চাও···তুমি চাও···ভয় পেয়ে উঠে বসি আর তখন বাদবাকীটা মনে পড়ে—লায়লার রুটি···লায়লার রুটি···লায়লার রুটি···

মাতাল! গোর হাসে।

জাহাজীটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বালতেই গোর ধমকায়—আলো জ্বেলো না।

কেন?

—পরীরা পালাবে।

—আঃ। জাহাজী হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে—লায়লার রুটি। সবুজ আলো, সন্তু, জ্যোৎস্না—মেট, এসব কোথায় গেল? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে! কিছু নেই!

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গোর দিক ঠিক করতে পারে না। আসলে গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গোর—গোরা—বগলাপতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে! কিন্তু এখন—এই পরীদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গোর কেবল

নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ—বেশ্যার চোখের কাজলের মতো—সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাসে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজী হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে—এটা কোন্ জায়গা! অ্যাঁ! কোন্ জায়গা? থামো মেট!

গৌর থামে।

একটা পুরোনো প্রকাণ্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝুম! চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গম্ভীর গলায় বলে— কী জানি।

জাহাজীটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটা আমার চেনা।

গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তার খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিস পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষে কটা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

গৌর হাই তোলে।

জাহাজী হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে—বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।

—কার কাছে?

জাহাজী ফিস্‌ফিস্ করে বলে—সন্যুর কাছে।

গৌর চমকে বলে—এই বাড়িটাই?

জাহাজী গম্ভীর হয়ে বলে—এই বাড়িটাই!

তারা নামে। আগে জাহাজী, পিছনে গৌর।

বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ

পাওয়া যায়। আর বহু পুরোনো এক বন্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।

জাহাজী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত। জাহাজী শ্বাস ছাড়ে।

বলে—মেট, চলো। দেখা যাক।

দুজনে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। সিঁড়ি যতই ওপরে উঠেছে ততই আরো অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুনবালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে থাকে। মুখে গায়ে ঝাপটা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।

—ক তলায়? গৌর জিজ্ঞেস করে।

—দশ তলায়। আমার মনে আছে।

গৌর অবাক হয়ে বলে—কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার পাঁচ তলা!

—ঠিক বলছো?

—ঠিক। এ কলকাতার পুরানো বাড়ি, চুন সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশতলা হয় না।

—তাহলে! বলে জাহাজীটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে—তাহলে ক তলায়! ঠিক মনে পড়ছে না তো!

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝি হঠাৎ ডেকে উঠে আরো নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে তো খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরীরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোর গন্ধ।

দুজনে আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তার খসে, চুনবালি পড়ে সিঁড়িতে পুরু আস্তরণ! পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইঁদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানালা হাঁ-হাঁ করছে খোলা। বেশীর ভাগেরই পাল্লা নেই। দু-এক জায়গায় বাঁশের ঠেকনা দাঁড় করানো আছে। জাহাজীটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে।

চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোঁকে

কোনো ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু-একটা কোটো-বাউটো পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।

—মেট।

—উম্।

—এই বাড়িটাই। এইখানে সু্য থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশী। ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে। ইঁদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঁঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এঘর থেকে ওঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক একবার এক একটা জানালা দিয়ে ঝুকে দেখে জাহাজী। মাথা নেড়ে বলে—এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো! অন্য ঘরে চলো মেট। যে-ঘর থেকে সবুজ নিওন সাইনে দেখা যাবে—তুমি চাও লায়লার রুটি—সেইটাই সু্যর ঘর। প্রথমে জ্বলবে 'তুমি' তারপর 'চাও' তারপর 'লায়লার' সবশেষে 'রুটি'।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যানট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরো বাঁশের ঠেক্‌না, ডেব্রিস, ইঁটের স্তূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজী। চার দিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা ম্লান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজী মাথা নাড়ে—না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। সু্য তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখন সে লুকোতো তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে জ্বলে উঠত—তুমি চাও…তুমি চাও…তুমি চাও…লায়লা …লায়লা…রুটি। সবুজ আলোয় ঝল্‌সে ঝল্‌সে উঠত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি গিয়েও ছুঁতে ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত।

তখন আবার পাগলের মতো খ‍ুঁজতাম। বাইরে তখন সব‍ুজ আলো দপদাপিয়ে উঠত—ত‍ুমি চাও···ত‍ুমি চাও···ত‍ুমি চাও···এইরকম ঘরে সেইসব দার‍ুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর-কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজী। বলে—ব‍ুঝলে মেট, বড্ড কালো ছিল স‍ু, কিন্ত‍ু মধ‍ুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরী চোখ—

—খয়েরী? অবাক হয় গৌর।

—খয়েরী নয়?

—দ‍ূর! বাদামী তো।

—তবে তাই। জাহাজী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়।

—আর ফর্সা রঙ।

—ঠিক আছে।

—আর কালো চুল।

আই। জাহাজী বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার প‍ুরোনো পিছল অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মান‍ুষের নয়। চামচিকে. আরশোলা, ইঁদ‍ুর, ঝিঁঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে ডাকে। একটা বহ‍ু প‍ুরোনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে এখনো রয়ে গেছে। তাতে একশো দ‍ুশো বছর আগেকার মান‍ুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দ‍ু বিন্দ‍ু গ‍ুঁড়ো গ‍ুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়! ঝিরঝির ঝ‍ুরঝ‍ুর! ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজী হঠাৎ লাফ দিয়ে দ‍ুই ধাপ সিঁড়ি উঠে যায়।

কর্কশ চাপা গলায় বলে—মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

—দরজা?

—দরজা। দ‍ুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছ‍ুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজী দেশলাই জ্বালাতেই দেখা যায়, দ‍ুই, মান‍ুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নীরেট বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজী হাতের দরজাটা দেখে বলে—মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

—এইটাই কি স্যার ঘর ?

—মনে হচ্ছে।

জাহাজী সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে—কে আছো !

সাড়া নেই।

—কে আছো ?

সাড়া নেই।

জাহাজী ক্রমে ক্রমে জোরে, আরো জোরে কড়া নাড়তে থাকে।

—কে আছো ? কে আছো ? কে আছো ?

প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষ্যে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজী দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ – অনেকক্ষণ ধরে শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। চোখের সামনে রঙীন ডানাওয়ালা পরীরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে থাকে।

— মেট।

—উম্।

ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

অ্যাঁ।

—কেউ আছো। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরোনো কাঠের দরজার গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনো শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাসে কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফরফর করে উড়ে যায়।

—কোথায় শব্দ ?

—মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড় কষ্টের শ্বাস। শুনতে পাচ্ছো না ?

—না।

জাহাজী আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ঠ মুখখানা গৌরের মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

—অ্যাঁ ?

—এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায় টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—কী বলছো ?

—এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের শ্বাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম শ্বাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

—তাহলে ? গৌর তার হথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

চুপ। জাহাজী ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে—ডিসটার্ব কোরো না।

—কাকে ?

—যে মরছে, তাকে সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের কত খোঁজা, কত না-পাওয়া! বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে! আহা! এতদিনে একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মরার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইয়ে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা-মাকড় পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজী দেশলাই জ্বালে। ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, 'তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই সত্যু রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে—সত্যু ?

—সত্যি।

জাহাজী আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজীর দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গোর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজীর আঙুল ছোঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনোখানে আলো নেই। তবু গোর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা—তুমি চাও…

প্রকাণ্ড, ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজী দাঁড়িয়ে। গোর হাত বাড়িয়ে তার কাঁধটা ধরে।

—কিন্তু সেই নিওন সাইনটা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

জাহাজী শ্বাস ছেড়ে বলে—কোথাও নেই। কেবল ঐ ঘর থেকে দেখা যায়।

মাতাল! গোর হাসে। বলে—চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দুজন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাঁকা, চুন সুরকির স্তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেকনা রুজু রুজু দাঁড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে পথ করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্প পোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই 'তুমি চাও লায়লার রুটি'-র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গোরের মনে হতে থাকে, আছে। কোথাও না কোথাও আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনো রুটি পাওয়া যায় কিনা সে জানে না। ওরকম নিওন সাইনও তার চোখে পড়ে নি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখেছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ঐ রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান—তুমি …চাও…লায়লার…রুটি। ঐ কথা কটি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনো জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের ভিতরে কানায় কানায় উথাল-পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিওন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরো এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিং ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে! নিওন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চারদিকে। আলটপকা বেরিয়ে থাকা লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেকনোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলদে আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তূপ পার হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট করেছে দেয়ালে। বড় ভাল লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজীও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

—কী সুন্দর সিলিং! গৌর বলে।

—উম্‌!

—ডুম জ্বলছে!

জাহাজী শ্বাস ফেলে বলে—ওটা সিলিং নয় মেট।

—তবে?

জাহাজী বিষণ্ণ গলায় বলে—ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনো তলা নেই।

গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো। বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ঐ চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না

ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে। পরীদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখায় উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। 'ওড়ো বাবারা ওড়ো' সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজী তার হাত ধরে—মেট, একমাত্র স্যুর ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ঐ বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু স্যুর ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টু-নাইট শী উইল এণ্টারটেন ওনলি ওয়ান গেস্ট। ডেথ।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাঁই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দমকা ধুলো-বালি উড়ে আসে। চোখ কিরকির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা—অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। 'ডেথ' কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নিচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ায়। স্বপ্নের ঘর।' দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্যু—জাহাজীকে যে একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন—তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনো ঘরের জানালা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে স্যুর গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি শ্বাস শেষবারের মতো টানছে স্যু, অন্ধকারে একা।

জাহাজী দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে—বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঁঝি, ইঁদুর, আরশোলায় শব্দ। আর সব শব্দের আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে

গৌর। ক্ষয়ের শব্দ। ঝিরঝির কুরকুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড়্ দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে জলে মাটিতে প্রবল ভালবাসার শীৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়োচ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু-পরীরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরোনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর কবে বাড়িটার বুক; অন্ধকারে তার অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারগুলো খসে পড়ে। মৃত্যু-ভয়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে সে।

তারা দুজন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজী হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে—চলো মেট।

গৌর ঘাড নাড়ে।

ল্যাণ্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতেব গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যাণ্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে—চল্ বাবা ল্যাণ্ডু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা চেনা যায় না। পুরোনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝ-রাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইণ্ডস্কীনে। চাঁদের হলুদ আলো, টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার. ওয়াইপারের কাঁটা দুটো পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটাগুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাঁচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দুজনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বদ্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাঁচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফাঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্ট ছোট্ট ফুটোর মতো কয়েকটা আলো! বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইণ্ডস্ক্রীন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভাল করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা! মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যাণ্ডমাস্টার ঘড়ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যাণ্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার! তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যাণ্ডমাস্টারটার সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

—শালা! গৌর বলে।

—কী? জাহাজী ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

—শালার ল্যাণ্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজী উত্তর দেয় না। উইণ্ডস্ক্রীনের ঝাপসা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকাণ্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

—মেট, ঐ বাড়িটা আমার চেনা। আর ঐ বাগান।

—আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজী মুখ ফিরিয়ে বলে—ঐ তো সেই বাগান যেখানে সনু আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

—অ্যাঁ!

জাহাজী মাথা নেড়ে বলে—ঐ সেই ভিক্টোরিয়ার বাগান। চারদিকে অন্ধকার, তবু দেখ ঐ বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো পড়ে আছে।

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে—কোথায় জ্যোৎস্না?

জাহাজী গম্ভীর গলায় বলে—আছে মেট। আমার জন্য

এখনো একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজী হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।

কোথায় যাবে? গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—ঐ বাগানে আর একবার আমি যাবো।

—পাগল! যা বৃষ্টি!

জাহাজী মাথা দুলিয়ে বলে—জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাবো। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।

গৌর হাত বাড়িয়ে লক্ খুলে দেয়। বড় মায়া হয় তার। আহা, দুঃখী জাহাজী যদি ঐ বৃষ্টির ফাঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক।

দরজা খুলতে খুলতে জাহাজী বিড়বিড় করে বলে—সু... জ্যোৎস্না.. সবুজ আলো...লায়লার রুটি...

বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজী। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস, প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।

হুড় হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোঁটা। সব ওলট-পালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর, বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁশ-জড়ানো চোখে, জাহাজী বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।

চারটে দরজাই ভাল করে লক্ করে গৌর। হাই তোলে। পরীদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সীটে তার দুটো রুখো-শুখো হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর বগলুর তিন নম্বর, হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেণ্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

দুই

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রঙচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের।

২

যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা-আঠা করে শরীর, তখন কলকাতার এধারের সওয়ারী ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, সন্ত্য জ্যোৎস্না, সেই জাহাজী। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগলুর তিন নম্বরের ঐটাই মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাড-মিক্‌শ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় ঢুকলে পুলিশের বিশ পয়সা। পুলিস হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিশের বাবা। কাট মারার চেষ্টা করলে এক চোখ ছোটো করে, আঙ্গুল তুলে নম্বর ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিসের, দশ ছোকরাদের। বেলাইনে সওয়ারী নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় কখনো আসতে চায় না গৌর, ব্রীজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সওয়ারীর লাইন, পুলিস ছোকরা তারপর সবার বাবা জ্যাম। তবু আজ এসে যেতে এল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবী হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারীর গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যারঘ্যারে। ইউ-পি লটারীর শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেই সময়ে ভাতঘুমে একটা ভাল স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারীর গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর—অর্থাৎ কিনা—গৌরহরি—বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেণ্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ঐ পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবীয়ানা।

সেই লটারীর ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল—ও বাবা, কোনো গাড়িই যে ইষ্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারবো না।

—হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে—ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদেরই শহর। আমরা মফঃস্বলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোঁটলাপুঁটলি। দশ বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাঁটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, জাঁতা, নতুন বেডকভারের পুঁটুলি থেকে উঁকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

—ও বাবা, আমরা পয়সা দেবো। ফাঁকি যাবে না।

—ট্যাক্সির কী দরকার! বাস্-এ চলে যান।

—উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়। বাবাগো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশী হয়ে গাড়িতে ওঠে! গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় সিঁদুর মাখা প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সে সব এখনো গৌরের সীটে পড়ে রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বে-লাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফর্সা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে একটা। বে-লাইনে আরো কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সীটে দুই পা তোলা, ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই—মলিন বসে আছে। কোনোদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে—মামু?

মলিন মুখ তুলে হাসে—কী রে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

—খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে—তোমারা সাউথ গ্যারেজে, আরামে আছো।

—আরাম কিসের?

মলিন হাসে—বেশ্যা আর ব্যাপারীদের গা আর বগলের গন্ধ শঁকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে—এখনো সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছো নাকি?

মলিন উদাস গলায় বলে—দিই। গাড়ির যেমন সওয়ারী দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিঘুঁজিতে ঘুরলে না তো, তাই তোমার চুল পাকে নি। তা সাউথে বৃষ্টিবাদলা কেমন? আর মেয়েমানুষ?

—গৌর বলে—কী যে বলো!

মলিনের মুখের আটক কোনোকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখৎ যেমন তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিসকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে লোটে। বলতে গেলে সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে দাঁড়ায় বড় হোটেলের তলায় মাতালদের পেঁাছে দেয়। শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পাণ্ডাদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিশ তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়কাটার মতিয়া কখনো-সখনো মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয়। সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লালচে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ! তাকে একবার পেঁাছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ। গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখে নি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখো-শুখো হাত-পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর—গৌরা—বগলুর ছাওয়াল—সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত—হয়তো বিয়ে করতো মেম। এতদিনে কত কী হয়ে

যেত গৌর! মতিয়া সেই গৌরকে দেখেই নি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রূক্ষেপও না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে এক বাড়ির সামনে। চাকর এসে টাকা দিয়ে গেল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই—গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটাওর। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনি বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুঁকলে বোধহয় মতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে—তোমার ফাৎনা নড়ছে গৌর, দেখ।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাতফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফর্সা বৌ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে লক করা বলে দরজা খুলতে পারে নি, নইলে উঠে বসত। ভুখ্‌খা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালার আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক দুই দিন বৌ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে—গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা এক ভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—কেন?

—গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাত দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলে। বৌটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে—বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পোঁছোতেই হবে।

—লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকনো গলায় বলে—লাইনে দাঁড়ালে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাবো। অন্ততঃ আধঘণ্টা—বড্ড বিপদ—

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা-সুদ্ধ মানুষ রাস্তায়

দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ, বিপদ' বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স ? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে ? যেদিকে, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সওয়ারী ছাড়া তুলবেই না। পুলিস ডাকো, তম্বী করো, মলিন উত্তর দেবে না। পুলিশ লাইসেন্স কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে, লাইসেন্স তার পোষা পাখির মতো। লোক-দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখ্খা পার্টিদের পিঁজরাপোলে বৃথা টক্কর মেরে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূর থেকেই খেঁকিয়ে বলে—বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভীতু ধরনের, বৌটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে চারদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে—ঐ গাড়ি কি যাবে ?

মলিন মাথা নাড়ে—না দাদা, আমার বিয়ের পার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাসে লোক গাদাই হয়ে আছে। চারদিকে মেলার ভিড়। লোক যে কোথা থেকে আসে! কোথায় যায়!

কোনো দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন ?

পি. জি. হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাকসিনের ডেট আজ। সেকেন্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাকসিনটা না পড়লে কী হয় না হয়—

মলিন মোলায়েম গলায় বলে—বাসে চলে যান না! এখনো পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পৌঁছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও!

আই বাপ ! ঐ জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে উড়ে যেত গৌর ! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত-পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত। হত মেম-বৌ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাকসিন বের করে নি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরো পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রীজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পৌঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়—উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে—উঠবো ?

—বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বৌটা ভারী খুশী গলায় বলে—কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বের করছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরী কলা-বোঝাই লরীর পেছনে পঁ্যাপোর-পেঁা হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামীর বাচ্চা—গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বেরিয়েছে। তা এতদিন কী করছিল মানুষ ? হোয়াট বিজনেস ? গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখো শুখো দুটো হাত-পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব কটা হাত পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকো। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্য সময় হলে গৌর অন্তত 'শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না,

মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত-পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বেশী দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরী মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সওয়ারী এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গতির উত্তেজনায় বৌটা বাচ্চার ভ্যাকসিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয় পাওয়া হাসি হেসে বলে—মাগো কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখ!

লোকটা কাঠ-কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝটকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ করে গাড়ি। গৌর দাঁতে দাঁতে চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দান-মুখো। গৌর ভ্রূক্ষেপ করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সওয়ারীরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনো দশ মিনিট বাকী, গৌর গাড়িখানা পি জি-র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোরে গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে

থাকে। চারটে বাজল, দাশ কেবিন। দক্ষিণের সওয়ারী পেলে ভাল। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ-মুখো দাঁড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাঁইয়ার হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম্ করে বেজে ওঠে। মাইরি! একী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে তবে মাগীটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাট্টা করে ছেড়ে দেয়। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনো চিন্তা করে নি গৌর। না রাখোহরির কথা না তার বাপ বগলুর কথা। তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কানকি মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝলসানো হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধাজাগা অবস্থায় বড় করে শ্বাস ফেলে। মাগীটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ—গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড হয় পুরো মানুষ নিত নয়তো নিত হাত-পা-চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল। সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগীটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডেটা যদি তার হাত-পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওর শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত-পা দেখিয়ে দিত গৌর বলত—এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝমঝম পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা-বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙীন বাচ্চারা। খুব ভিড়। পোলিওর ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মার হাত থেকে ছুটে ঐ কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনোখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝমঝম শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আঁশ জড়ানো। পিছনের কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতী মেয়ের মুখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারী হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দুখানা তাই বোধহয় এত উজ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুলোটে কাচের ওপারে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপব একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদীর নকশা দেখে।

- কী চাই? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক-পা দু-পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝমঝম।

—গাড়ি জায়েগী?

—কাঁহা?

—পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

—কিরায়া কোন দেগা?

মেয়েটা হাত তুলে দাঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল—উও। ভঙ্গীটা বড় ভাল লাগে গৌরের।

গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা-পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতী লোক বসে বুড়ীর মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে।

—কী হয়েছে?

—বড্ডী গরম ছে, দাঁতী লাগী।

—ও তোমার কে হয়?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে—শাস্‌।

—আর ঐ লোকটা?

তেমনি উদাস মুখে মেয়েটা বলে—আদমী।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল, হাতে মেহেদীর রঙ, তবু তার কোথায় যেন রঙহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি,

রুপোর গয়না, তবু হাত দুখানা বড় উদ্দেশ্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা—তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের ক্ষেতে গোধূলির নির্জন উদাসীন বৈরাগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে—এখানে মরতে কী করছিলে?

মেয়েলী হিন্দিতে মেয়েটি বলে—ক্ষেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের ক্ষেতটাও ছিল ছোটো। আদমীটা বাজী দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজী দেখাই। আমার আদমী লাঠি ঘোরায়, চারটে ছোরা শূন্যে ছুড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁট-মাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়—কত কী করে!

—আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে ঝমঝম করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর—অর্থাৎ বগলুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টারে এখন এক দাঁতি-লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে—নেবো, নিয়ে এসো।

—কত নেবে?

—মিটারে যা ওঠে। বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোটো করে বলে—আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিও।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতী উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে—কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিও।

বালা-পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না।

মেয়েটা ঝুঁকে বলে—একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি, কাটারী ওঠে ল্যাণ্ডমাস্টারের লাগেজ বুটটে। ইতক্ষণে মেয়েব নাকেব নিচে নিটোল ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে জবজবে ঘাম, পাগড়ী শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সীটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দুখানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফটি পারসেণ্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যাণ্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শীগগীর পেঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পেঁছায় না। ময়দানের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়ে চড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছো? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে—সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

—তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে—সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে—চোপ। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে—আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

—নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাবো।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

গৌর বিনীত স্বরে বলে—পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না। কিংবা মারো লাঠি। পুলিসও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝকঝকে সরল দাঁত সে কারো দেখে নি।

দেহাতী লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশীদূর নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘূণচক্করে ঘুরে খানিক মিটার ওঠাবে মাত্র। দেহাতী বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখো-শুখো হাত-পা-ওলা আর মাথায় এক বেহন্দর মাগীর পাগল নাচ নিয়ে গৌর কোনো শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায় ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ্য করে নি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয় তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যান্ড-মাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে-জায়গায় টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নায় চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ী আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোটো করে জিব বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছ তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার বিরক্ত হয়ে ভীতু গলায় বলে—একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মার শরীর ভাল না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পীড কমায়, আবার বাড়ায়। ক্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যান্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ী একটি দেহাতী মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে

পারে !

ল্যাণ্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যেই কোণে বসে আছে সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যাণ্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালী চুমকির পিছনে তার মুখ। চকমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেই দিনই ল্যাণ্ডমাস্টারের দশ পারসেণ্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতাব সুবাস-ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে-ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যাণ্ডমাস্টারের গদীর গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড় টাকার মতো বেশী উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙীন বলগুলো ওড়ে কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দে গোলা ছোঁড়ে শূন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢাকা মুখে আবার জিব ভেঙায়। তার থাঁদা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। দেহাতী শরীরের কাঁচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ-মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব ল্যাণ্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকোনা বাতাসকে টৈটুম্বুর করে দেয়। গৌর শ্বাস টানে। তবু সওয়ারী খালাস দিতে হবে বগলুর তিননম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দুখানা রুখো-শুখো হাত-পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যাণ্ড-মাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তনশীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার

কামান কোন দূরে থেকে ঠিক রঙীন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহরে বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিস হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলায় বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

গৌর শেক্সপীয়ার সরণী পেরিয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ-ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বেণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর হয়ে বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ি জোর টানে ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদীর মধ্যে দেহাতীরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক-সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে। আবার ভুলে যায় গৌর। আবার মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতী মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিওন সাইন দপদপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ নিওন সাইন দপ্ করে জ্বলে উঠে বলে—তুমি··তুমি··· চাও···চাও·· লায়লার···লায়লার·· রুটি···রুটি·· আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমক্ষেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যান্ডমাস্টারের সামনে পার্ক স্ট্রীট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যান্ড-মাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল

জাহাজের ভোঁ-ও-ও-ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যাণ্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এবং বিদেশী বন্দরে আঙুরের লতার ছায়ায় থোপা থোপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্টো বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া ল্যাণ্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভোঁ দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিমন্ত্রণ। গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে, ঐ হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ঐ টিলার ওপরকার রঙীন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও। কী যে চায় গৌর তা ঠিক-ঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায় একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যাণ্ডমাস্টার জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে। আঙুর ফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট বাড়ি রঙীন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে—এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···

আই। আলবৎ গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিক ঠিকানা নেই। এক একদিন তার মৌতাত জমে উঠলে ল্যাণ্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জঙ্গল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো যাবে, কোনো ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নিচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের ক্ষেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূর বিদেশী বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙীন

ফুলে-ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনো। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার, ল্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, কলকাতার সঙ্গে সেঁটে গেছে বগলুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ্! আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যান্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিলে বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। এক ঝট্‌কায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায় পিছন থেকে দেহাতী লোকটা চেঁচায়—রোখকে রোখকে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতীরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে—কিৎনা?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠেছে। যখনই মৌতাতের সময়ে এরকম অদ্ভুত সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

—পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে এই রুখো-শুখো হাত-পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়। আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতী। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতীর কাঁধে একটা ভাগলপুরী চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাফে দেখে দেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুন রোদে নাচতে নাচতে তার পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো, কতকাল সে গেহুঁর ক্ষেত্রী দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কতকাল নিজের আনন্দে নাচে নি সে! গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছাড়ে, দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সীটে একটা রঙীন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনো সওয়ারীর গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপটা। গৌর টেরও পাবে না।

তিন

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয় নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দুখানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জম্‌জম্‌ করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময়ে আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙা-চোরা দু'একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, ছেঁড়া বই-কাগজ, সংসারের জমে ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখলে নিয়েছে রাখোহরি এই হাফ-ফিনিস বাড়িটার ওপর দাবি-দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবে না। কিন্তু কেবলই একটা আশা নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না। রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? যদি সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরানো ব্যাটারী, পুরানো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দুখানা সস্তা বেতের চেয়ার, দু-একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ফ্যান, দু-একটা থালা-বাসন। ব্যস আর কিছু নেই। ঘর দুখানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা নন্দীরা সীমানা-দেয়াল দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখো-হরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক আধদিন কুচো নিমকি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। ডাঁটো শরীরের মেয়ে, দুবার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিমকি। এসব গৌরের সামনে রেখে নন্দীরা তার

নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেওয়ালের জন্য সুতো ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল—দেখ তো, ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাকগে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেক। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোন মতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিঁপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কাঁচাকাঁচ্চি জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায় নি। গরু ঢুকে আগাছা খায় মট্‌মট্‌ করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দূরে সেপটিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রঙচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুকসমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাঙ গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারী পুকুর। অনেক রাতে পুকুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে। দেশ-গাঁয়ের শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝাঁক পিন্‌ পিন্‌ করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যাণ্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়াল ঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম, গ্যারেজে খুটখাট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা দেখে আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ল্যাণ্ডুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

কদিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তা-ঘাটে এখনো হাঁটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করে নি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠছে একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে! জামরুল গাছে এবার ফুল আসে নি। খুব পিঁপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাঁস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুঁটি ধরে পিঠে চাপে একটা মাদী হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তলতলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে,

একটা হাঁস সেটা কপ্‌কপ্‌ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসেছে গৌর। কলকাতার একখানা স্ট্রীট ডাইরেক্টরীই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপহছান এখনো তার শেষ হয় নি। কবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভাল ঘরখানা! তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের লোকদের সাথে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন—এরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তাঁর। তাই এই বাড়িটা করে এক গরীব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল—যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তার পাঁচ ছেলেমেয়ে, বৌ, বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিওন। কী ভাগ্যে তার বৌটা হল সুন্দরী। সেই বৌই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার, বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোতো, একটু বেশী রাতে ফিরে আসত আবার। ঘরের বৌয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা—সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক ছোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনো মুখের বঁড়শি ছাড়াতে পারে নি। চলে আসত রবিবারে রবিবারে। তাতে মাছ, মিষ্টি, দৈয়ের হাঁড়ি, বৌটি তাকেও খুশী রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমতন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বৌটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্যাণ্ড পাল্টে ফেলল। কিন্তু পাড়ায় তখন তার বৌয়ের নামে চিচিক্কার। কত লোক যে তাকে দামী গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ্য করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পোঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বৌয়ের পা টলমল করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সে সব শুনে

ভারী বিরক্ত হয়ে বলত—রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ঐ বৌয়ের খপ্পরে পড়ে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা মাঝে মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত—কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলো তো! তুমি সত্যিই কিছু করো-টরো না তো? বৌ কেঁদে বলত—ওমা! তাই কি পারি! নিতাই বলত—আমার গা ছুঁয়ে বলো যে তুমি ওসব করো না! বৌ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত—তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে কদিন নিতাইয়ের বৌ বেরোতো না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোতো, ফিরত রাত নিশুতির সময়ে। আবার তার বিয়ের আগের ছোকরা প্রেমিক রোববার দৈ, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষো শুনে ডেকে পাঠালেন—এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন—ওরকম বৌ হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচজন পাঁচ কথা বলেছে! ঐ বৌ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ী লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠতেন—তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবী পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নত হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকা পয়সা কোন গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরো দুই ছেলে মাধু আর সতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, চুরি-চামারি দিয়ে বাল্যজীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। বাড়ির বৌয়ের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে চারকাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেন নি, সুতরাং জমি তার নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব

বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতি-ভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চায় নি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান। নিতাইয়ের পকেটে বিস্তর নম্বরী নোট। তার আদুরী বৌ বাড়িতে পাকা বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিয়ে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে, ফি বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপুরি আসত। হঠাৎ সে সব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষপার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়লেন—দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না? বগলাপতি শ্বাস ফেললেন। মানুষটা বিষয়ী বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন—আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাও নি, এখন আর যাবে কোথায়? এখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা-নুলো ছেলে আছে, গোরা। ওর যদি কোনো চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিও। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন—দাদা, আমার মা-বাপ হয়েও ঐ বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছে, তো তোমার গোরা! আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে-খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল কেউ ফিরেও দেখে নি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখে নি। বড়বৌমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা

রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা! কুকুর বেড়ালটা যে এঁটো-কাঁটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ঐভাবে একরকম হাত-ছাড়াই হয়ে গিয়েছিল। বগলাপতি আর উকিল-মোক্তার করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না-হয়-এর জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাকে ডিক্রী দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। রিফিউজিদের জমির মায়া বড় বেশী। কলোনী থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেন নি। উপরন্তু তিনি পুরানো আমলের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তাঁর ভাল লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময়ে ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফাঁক ফোঁকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন। আবার ধৈর্য ধরে সেই সব ক্ষয়পূরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তার স্বভাব। যার কাছ থেকে আজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তাঁর সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানীকে তার বোয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানী ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনো বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারী অফিসের পিওন বা আর্দালীরও বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন—এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়োবয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমিটা নিয়ে কথা উঠতেই বগলাপতি বললেন—ওটা ছেড়ে দাও। জবরদখল জমি, ওটা বিক্রয় করা যাবে

না, আমরা থাকবোও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল—জমির জন্য বলছি না। সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তার জন্য কিছু করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন—ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুণ্ডা বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুঁসে উঠে বলে—আপনার ঐ রকম ছেড়ে-দাও ছেড়ে-দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন—কী করবি তুই। কী করতে চাস? রাখোহরি বলল—মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ঐ নীরেস চার সাড়ে চার কাঠার জন্য মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বরাবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেন নি।

কিন্তু রাখোহরি দাপুটে লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রী পেলেও উদ্বাস্তু কলোনী থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিস গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজ গাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোতো গৌর। দু চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেণ্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল—তুই ঘুরে-টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেংচে নেংচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর থেকে দেখতে পেল ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরোনো আমলের গাড়ি—এখনকার মতো

বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ছোটো ছোটো। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার কদিন পর সেণ্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বৌ। পালে পার্বণে তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে! সেদিন আর নিতাইয়ের বৌ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে অনেকক্ষণ হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা-ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে পড়া! বড় লজ্জা করছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বৌকে দেখিয়ে বলল—দেখ, এখনো তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেত চলে যেতে পারি! যদি বিয়ে করি তো বৌয়েরও ভিসা পেয়ে যাবো। তখন গৌর অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম-ঘাঁটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ-গেরস্ত বৌয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বৌটাকে। রাখোহরিরও ফোরসাইট ছিল। বুঝেছিল মেয়েটিকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্প সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বৌ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডাস গ্রীনের শীতের রোদ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখীন জঙ্গলে শিকার, গল্ফ লিঙ্কে ছুটির দুপুর, উইক এণ্ডে সমুদ্রের ধারের একশ মজা—সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার আর নাচ। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী হ্রদের ধারে চেরী আর আপেলের ক্ষেত, ইটালীর জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়ানো। কলকাতার দায়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বৌয়ের বুকের ভিতর ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সীটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ঐ সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবল বিদেশী রাস্তার দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বৌটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনোদিন পুরো মানুষ বলে ভাবে নি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্ত-কাল হাওয়া টাওয়াও ভালই দিচ্ছিল, দু চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো—সে সময়ে গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল রাখোহরি নিতাইয়ের বৌকে বলছে—চলো আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি।

—সে কী? তা কী করে হবে? বৌটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে —আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাই-ভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দূরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট ভিসা তো চাই। তাই ম্যারেজ সার্টিফিকেটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রী করে আমি তোমাকে বৌ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বৌয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে তারপর—

বৌটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নার গৌর দেখে, নিতাইয়ের বৌয়ের ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বৌটা। মিনমিন ঝরে জিজ্ঞেস করল—কবে?

সাড়ে চারকাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে ধরল—দাদা, এ কী শুনছি?

—কী শুনছো?

—সে যে বড় পাপকথা! এ সব করবেন না, ভাল হবে না। আমি পুলিসে খবর দেবো।

—দাও! উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

—এ সব করবেন না। আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার

গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বৌ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ বৌ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে পরে আছে তারা, টেরিলিন টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যান্ড পাল্টেছে। বৌয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে বাচ্চা কাচ্চা হতে দেয় নি। এখনো কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বৌ পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী? এমনটা তো কখনো ভাবে নি নিতাই!

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল—কী আর খারাপ কাজটা করেছি। একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেবো।

—ও সব ব্লাফ। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন। আমি জানি।

—জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন?

কিন্তু নিতাই যে তাকে অনেক বুঝিয়েছে, এবং বৌ বুঝতে চায় নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল—দাদা দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

কদিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে-ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিশ পড়ার আগেই তার বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর একটু বড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেণ্ট লাগিয়ে রঙ করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দুখানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছুই না। তবু গোর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগলুর ফোরসাইট ছিল, রাখোহরিরও ছিল। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালিগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজে যাবে। তাই আছে থেকেই

করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালীগঞ্জে। জঙ্গলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে একা পড়ে আছে গৌর। মাঝে মাঝে সে ভাবে বোধহয় বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এই সব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু-একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হাল্কা মিহি নরম কী যেন সব পড়ে আছে বাড়ীটাতে। হওয়া দিলে সেগুলো উডে উড়ে বেড়ায় চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক একদিন দেখে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হাল্কা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে, উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেইখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা বাসনার ছাপ, ইচ্ছা অনিচ্ছা থেকে যায়। সে সবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইঁট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বৌ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্রলোক, রাখোহরির ছেলে বৌ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁশের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাঁধে বা মাথায় বসে ডানা কাঁপায়!

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে এই যে এখন দিন দুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় চেয়ার

টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি, জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পল্‌কা জিনিস দিয়ে তৈরী। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কব্জায়। আরও আছে রাখোহরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন-টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারি নেমে আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরাজি প্রার্থনা সংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখে পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তার! ধর্ম সংগীত ছিল তার প্রাণ। যীশুর ক্রুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। যীশুর পুনরুত্থানের দিন তার গলায় রোদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই সুখ তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাইফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে শিয়রের কাছে বুড়ো-সুড়ো সান্তাক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামী দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন ভ্রূর নিচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ! সেই জলের নিচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপ কাঁটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিঁড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স বলল—'অ্যাও, কাঁদে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভান্স। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোষাক,

গম্ভীর মুখ সকলের! শব-বহনকারী গাড়ীর পিছনে সেণ্ট অ্যাণ্টনিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবেরা কাঁদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল—গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যাথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে, ঝুর্‌ঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে, তখনো ফাদারেরা কেউ কাঁদে নি। সাহেবেরা কাঁদে না—গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে কবরে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে একটা ভয়-পাওয়া ছোট্ট ব্যাঙ লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে, সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাঙটা প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে। সেই সময়ে গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দু-হাত বাড়িয়ে ব্যাঙটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপব, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তাঁর বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষণ্ন দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ঐ ছবিটা রয়ে গেছে—ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাঙকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়ছিল। তাঁর অঞ্জলি-বদ্ধ দুই হাতের তোলায় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাঙ প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো উড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনো তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুখানা বিস্কুট।

—কী খবর? গৌর আলগাভাবে জিজ্ঞেস করে। মেয়েটার গড়ন বেশ। বয়সকালের লকলকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল—গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

—বেরোবো।

—কখন?

—এই তো। বেরোলেই হয়।

—আমি আর মা একটু কালীঘাট যাবো। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে—কালীঘাটে গিয়ে কী হবে!

মেয়েটা বলে—মা পুজো দেবে। মানত আছে।

—ও। আচ্ছা নিয়ে যাবো।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে—জিজ্ঞেস করলেন না কিসের মানত?

—কিসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থমথমে করে বলে—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে যে, তাই।

—ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থমথমে মুখেই বলে—সব কি বলতে আছে।

—কেন, বলতে নেই কেন?

—ভাঙচি দেন যদি!

—ভাঙচি দেবো? কেন।

—অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে ডুবে ছিল সে, দুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক

দেখছিল! সেই ডুব জল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পাল্টে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ্য করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে—ভাঙচি দেবো না।

এই মেয়েটাকে দিয়েই চা আর কুচো নিমকি পাঠিয়ে গৌরের একহাত জমি এনক্রোচ করেছিলো নন্দীরা। গৌরের সেইকথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না! হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুচো নিমকি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েকপলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির একহাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত—কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের পার্সেণ্ট হাফ-ফিনিস—বগলুর তিন নম্বরের ল্যাণ্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে-বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে—আপনি আমার বিয়েতে ভাঙচি দিলে আমি খুশী হতাম।

—অ্যাঁ! গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেইখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সেই শূন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করে খুব। পিস্টন রিং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানলার শিক বাইছে। গৌর জানালায়

দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঐ দূরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ঐখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে উড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো হাত-আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড় একখানা মুখ। রুখো-শুখো দুখানা হাত-পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কবজায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি, গৌর ঠেকাতে পারবে না। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগীর নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাঙচি দিলে মেয়েটা খুশী হয়! আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানলা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখে নি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাঙচি দিলেই খুশী হয়? না কি যে কেউ ভাঙচি দিলেই খুশী হয়। কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা —'আপনি' না 'ভাঙচি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিঁপড়েরা দেয়ালে বায়, কেন্নো আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিকে বেয়ে বেয়ে ওঠে! ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরো সময় লাগবে। কত সময় ত ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা জীবন এখনো পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে-সবরে বসে

ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়! গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুরগী যেমন ডাকে।

চার

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরিই। বৌবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধে গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টৈ-টুম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধ্যে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উঁকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসীতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক টিপ দিতে হল আত্মীয়-স্বজনদের যে যার ডেরায় পেঁছে দিতে। দু খিলি পান গ্লাভস চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আছে। শব্দ আসে ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাঙচি দিলে খুশী হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম-ঘুম চোখে ভাবে। কথা কটা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থ-হীন ভালবাসার কথা তাকে কেউ কখনো বলে নি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুঁচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ঐ কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়,

গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুঁচো নির্মাকি আর চা-কে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে না। বিয়ের চিত্রিত পিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়ে ও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনো কিছু বলে নি গৌরকে আগে! বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। হাফ-ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুরো গড়া হয় নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কবজায়, বাকী অর্ধেক সে এক দুলদুলে মিহিন বোঁটায় দুলছে। কখন ছিঁড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু ঐ কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনো ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ঐ কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান মানুষ চায় না। ওরকম দু' একটা রহস্য থেকে যায়। বাংলাদেশে ঝড়তি পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যাণ্ডমাস্টার, সাড়ে চারকাঠা জমি এখনো দুখানা ভাল হাত-পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনো মালা দেবে। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। দুটো রুখো-শুখো হাত-পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ-ফিনিশ গৌর তার ভূতুড়ে ল্যাণ্ডমাস্টারের সীটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারী এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

কলকাতার সোয়ারীরা 'ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারী খালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপে-জুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফাঁকে সীটখানা দেখা যায়। সেই সীটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনায় মেয়েটা আরো

সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সরায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে—আরো সুন্দর হও, আরো আরো সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামী চামড়ায় দুর্লভ গোলাপী রঙ ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশী নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালী আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামী, চুলে মধুর মতো রঙ, চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ……

ডেডবডিটা মাঝে মাঝে মচ্ মচ্ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে বলে—চোপ্। নো ইণ্টারফিয়ারেন্স ইন লাভ…নো ইণ্টারফিয়ারেন্স …বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উল-এর বল গড়িয়ে যায় তেমনি নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি—বগলুর ব্যাটা—ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারীরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

—কোথায় যাবেন ? গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারীরা কত নাম বলে! টেরিটিবাজার, হাটখোলা, মুর্গীহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যুকূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ঐরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দুখানা মোটর সাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যাণ্ডমাস্টার তেমনি কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেই সময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুল-কুল করে বইতে থাকে। স্টীমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল জল-পুলিশ ট্রাফিক সামলায়। ঢাকার কামান দূরে থেকে রঙীন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্ন-শিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাছি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন

সেই বল—ফ্যাস্‌···ফ্যাস্‌ দি বল গৌর···গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিশ কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দুখানা ক্রস করা! সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো তখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিওন সাইন দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিওন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা কটা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফাস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর—ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূর যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ হতে থাকবে। ফুরোবে না।

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইণ্ডস্ক্রীনে! বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের মায়াময় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভস চেম্বার থেকে পুরোনো লটারীর টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলে নি. তবু টিকিটটা ছেঁড়ে নি সে, রেখে দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ! টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

খুনখুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো ঢোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাগরা দুলিয়ে গোলাপী রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমক্ষেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায় পায়ের বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাঁপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোঁতা নাকের নিচে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নিচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফিনফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে। তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতী যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজীর ছোরা বের করবে দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ডু হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে জনের কাছে যাবে মাঙতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকানো। পুরুষটা তার বাজী শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম্ করে এক পা ফেলে, আবার ঝম্ করে অন্য পা। জনে জনের কাছে ঘুরতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকেও হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে, সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি-চিনি

করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন একমনে বাজী দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন্ বন্ করে ঘোরায়। গৌর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে—কী খবর ?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে—ভাল। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন ?

—এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসবো।

—আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে—আবার যখন আসবো তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে—কাল—কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

—কী আছে দেশে ?

—কিছু নেই তেমন। গৃহ আর ধানের ক্ষেত, জল, মাটি, আর কী ? শীতের শেষে আবার আমরা আসবো। তুমি বড় ভাল লোক—

গৌর হাসে মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম্ শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত পুরুষের সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদীর নকশা, উল্কি, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তারা ল্যাণ্ডমাস্টারে বসে।

স্থলের গাড়ি জলে ভাষায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়।

তার সেই আশ্চর্য যাদুর খেলা কেউ লক্ষ্য করে কিনা কে জানে! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যাণ্ডমাস্টার। কখনো কখনো তার পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূরে জাহাজঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিসফাস করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায় গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে! সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরানো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই, হাঁ-হাঁ বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কষ্টের শ্বাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষ্যে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন—তুমি চাও···তুমি চাও···তুমি চাও···লায়লার রুটি। কোথাও পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে সুর ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যাণ্ডমাস্টার। উইণ্ডস্ক্রীনে বিদেশী শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে-যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যাণ্ডমাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মত ডানা কাঁপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় নেয় পুলিশ। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এস্‌প্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

—মামু, কী খবর? গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে—ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রঙ জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা

মড়মড় হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও.

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যাণ্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজয় অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যাণ্ডু আমরা দুজনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি।

বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালী চৈতলপাড়ার সোয়ারী ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।

—কোথায় যাবেন?

—কলেজ স্ট্রীট যাবো বাবা, নিয়ে যাবে?

পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদী সিঁদুর দগদগ করছে। উপোসী মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দুখানায় ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসী।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা-চেনা লাগে তার। ঐ সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশী বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিঁদুর, উপবাস—সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।

কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তোলে মেয়েমানুষটা, কী সুন্দর আঙুল! লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ। চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি—যেন বা পিয়ানোর রীডে—সুন্দর আলগোছে নড়ে! আর তখন একটা আঙটির হীরে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।

সেই হীরের ঝলকই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে। মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। একপলক ঘাড় ঘোরায়

গৌর আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রঙ ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপথালিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেলপাতার গন্ধ। এ কীরকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে—এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে—গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রঙ-ধুয়ে-ফেলা মতিয়া—তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেত-পদ্মের মতো কপালে নড়ে, হীরেটা ঝিকোয়।

সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে—বাবা, তুমি ঐ মন্দিরে কখনো গেছ?

—না।

—একবার যেও। বড় ভাল লাগবে।

—আচ্ছা।

—ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠাণ্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনো ছড়িয়ে আছে ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেও বাবা।

চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফোঁটাগুলি পড়ে। সেই অশ্রুর চিহ্ন গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।

গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রীট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।

ভ্রূ দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?

গৌর একটু হাসে।

মতিয়া লাজুক গলায় বলে—তাহলে আমাকে তুমি চেনো!

গৌর উত্তর দেয় না।

মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে—আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী!

মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।

—আসি বাবা। তুমি বড় ভাল লোক। মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত পয়সা গুণে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়। স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শূন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিকলির নকশা। কলকাতার নিওন সাইনগুলিতে কত পুরোনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

পাঁচ

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণ মুখো করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শো ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারী পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছমছম করে গৌরের। ঐ ডেডবডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে টিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারী তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষা করছে গৌর! তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো-শুখো দুখানা হাত-পা-ওলা দুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌবা যেমন কারো সার্ভেণ্ট না তেমনি না পয়সারও স্লেভ। কেবল এক আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যাণ্ডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেডবডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে। একটু সাবধান থাকা ভাল। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো চৌদ্দ বছরের হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে

দেখছে। মুখখানা শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গোরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গোর কারো সার্ভেণ্ট নয়। অসুক যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারী না হলে নেবে না। গোরহরি অর্থাৎ বগলুর ছাওয়াল গোরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

—ট্যাক্সি যাবে ?

—কোনদিকে ?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে—সাউথে।

—আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয়তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল—ওদিকেই।

—তবে উঠে পড়ো। গোরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে—ঐ গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারী। নাইট শো ভাঙতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া যায় মন্দ কী ?

—গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো। ঘষা-ফষা লাগে যদি ?

—লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গোরহরি। ছেলেটা পিছনের সীট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে—আর একটু এগিয়ে।

—কতদূর ?

—এই সামনেই—কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গোরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্যে হেডলাইট জেবলে এগোয়। বলে—গাড়ি ঘোরাবো কী করে ? ওদিকে বেরোবার রাস্তা আছে ?

—আছে। কোনো অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গোরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকা বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

—আর কতদূরে ?

—আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে—সেখানে।

—ইস্! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড-টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারো চাকর নয়। কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

—ওরে ব্বাস্। এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

—গাড়ি যায়।

—যায় যাক্। আমি যাব না। এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমার লোকজন ডেকে আনো। এইটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে

—এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও-প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে। চলুন না, মিটারের বেশী দেবো।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যাঁ! পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে। বগলাপতির আমলে পুরোনো ডজ গাড়িটার ছোটো আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরী নোটের ছবি দেখে নি।

—বেশী দিলেই কি! আমি যাবো না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

—যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

না গেলে কী করবে?

—বাচ্চা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল—চল্ শালা, ফের মুখ খুলেছিস কি ভোঁতা করে দেবো, ঢোক গলিতে—

গৌরহরি কোনোকালে মারপিট করে নি, মার খায়ও নি কখনো। বগলাপতি ক্বচিৎ কখনো চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন তার বেশী কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি—টিকাটুলির বগলুর পোলা গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌর তার ভাল হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল—খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়—

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা

ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দুজন ছায়ার মতো উটকো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল—হুজ্জতি করছে নাকি রে!

—একটু একটু—

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেবো তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যাণ্ডমাস্টারখানা? বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ বগলুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা—যেটা কখনো তার প্রাইভেট কখনো বা পাবলিক! গৌরের আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

যাবে কি না।

দরগায় সিন্নি, গীর্জেয় মোমবাতি, বদর-বদর—যাবো বৈ কি! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌর যাবে। যদিও বগলুর পোলা গৌরা কারো চাকর না—তবু ল্যাণ্ডমাস্টারখানা গেলে গৌরের আর থাকে কী! অ্যাঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখো-শুখো হাত পা আর মগজের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

গৌর একটু দম নিয়ে বলে—যাবো।

— গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন। তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

—আর কতটা পথ? গৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

—চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো-ছাটকা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যাণ্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরোনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়ি ঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ।

তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা অন্ধকার, নিশ্চুপ। কথা না বলে গৌর এগোলো। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুটকো-ছাটকা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল—এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগলুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কি! তার গাড়ির ডেডবডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনো তেমন কোনো বিপদে ফেলে নি তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত! তাছাড়া ডেডবডিটার আর কোনো নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেডবডিটা অনেক ভাল! তাকে নিয়েই তো এতকাল ল্যাণ্ডমাস্টারখানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে বগলুর ছাওয়াল—

আরো তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছজন, গৌর বে-আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ্য করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকের ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সীটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দুধারের দুজন সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সীটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল—চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জেবলো না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়া। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনো রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখে নি।

—কোনদিকে যাবো ?

—চলো সোজা। আমরা বলে দেবো।

পিছনের সীটে ডেডবডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত-পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেডবডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন-প্রাণ দিয়ে, তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যান্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

—আস্তে, বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি বায়ে করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনোখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা লোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচেছ। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কোঁক করে হেঁচাক তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দটা করল। অনিচ্ছাস্বত্বেও উইন্ডস্ক্রীনের ওপর ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে গরম একটু কী যেন ছিটকে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনোক্রমে টাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল—ব্যস, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনোকালে আসে নি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুঁকে বলল—একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে

দিও। পুলিসে যদি যাও—আমরা নম্বর টুকে রেখেছি—

বডি! গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল ল্যাণ্ডমাস্টারটায়! বগলুর দেওয়া গাড়িটাতে! ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

—কী হে, শুনতে পাচ্ছো, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

—যাও। লাইট না জ্বেলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাটা রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি—অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা তার অদ্ভুত সোয়ারীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল পরা দুটি পা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি! কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগলুর ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যাণ্ডমাস্টারে ডেডবডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওলায়? কোন অপরাধে হে বগলুর ছাওয়ালের—যার জন্য তার দুটো হাত-পা শুখো। আর মগজে ঐ বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি! কে জবাব দেবে?

পিছনের সীটে ডেডবডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছনে ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানলায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগলুর ছাওয়ালের ল্যাণ্ড-মাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়ে চড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ল্যাণ্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির—অর্থাৎ কিনা বগলুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে

যাচ্ছে ! মাইরি, এসব গাছপালা, রাস্তা, আলো এসব যে গৌরবাবু কখনো দেখে নি ! সোয়ারী যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু আজকের সোয়ারী যে শালা কথাও বলে না ! ভয় করে না নাকি, বগলুর পোলার ! অ্যাঁ ! গৌরবাবুর কি ভয় করে না ! কেন শালার ভয় দেখাও গৌরবাবুকে ! কোন অন্যায় করেছে গৌরা ? হ্যাঁ, সত্যি বটে মাঝে মাঝে সে সোয়ারী কাট মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয় নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল—অনেকদিন আগেকার কথা—গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর একবার দুটো কচি মেয়ে আর বৌ নিয়ে একটা মফঃস্বলী হাবা লোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে--হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম আর পুলিসের আওতায় যাওয়া—তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোক দেখানো জ্যাক লাগিয়েছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কচি মেয়ে আর বৌ নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরো অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যান্ডমাস্টারটার জন্য ঠেকে ছিল ? যে যার গন্তব্যে পৌঁছায় নি কি শেষ পর্যন্ত ? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী ! তবে কেন গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি ? বগলুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওলা ?

ডেডবডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লটপটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি ? অ্যাঁ ! উটকো উঠে বসে আছো ! কোথায় ! কে হে—?

নিঃশব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল।

ডেডবডিটা নিঃশব্দে বলল—আমি একজন—তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের কজনকে তুমি চেনো ? তবে আমি—বুঝলে—আমি এই সংসারের ভাল চেয়েছিলাম। ঐটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখ গৌরবাবু, সংসারের ভালমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালমন্দেও হাত পড়বে। তবু

এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখ না—আমার পেটটা—কেমন হাঁ হয়ে আছে! কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যাণ্ডমাস্টারের চমৎকার গদীতে শুয়েছি আরামে—আর উঠবো না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালই। দুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে—বাইরে জ্যোৎস্না—মোলায়েম বাতাস বইছে—এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশী সুখ আর কিসে? চালাও গৌরবাবু, চালাও—থেমো না। আমরা দুজনে চলো, এই ল্যাণ্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই—চলো হে বগলুর পোলা—

তা গৌর তার উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি, ডেকে বলছে—হেই গৌরহরি, ফ্যাস্—ফ্যাস্ দি বল—

গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে কুয়াশার সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে বেঁকে আকাশমুখো উঠতে থাকে। গৌরহরির ল্যাণ্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শূন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডিসহ গৌরের ল্যাণ্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা পয়সার অংক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে—ভালবাসা··· পরিপূর্ণতা···ঈশ্বর···

———